তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রয়োবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

১৮৫৩ শক

কলিকাতা

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড

আদিব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৮। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী।

ত্রয়োবিংশ কল্প, প্রথম ভাগ।

১৮৫৩ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২।

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

নববর্ষে অভিবাদন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই সংখ্যায় ঊন-নবতিতম বৎসরে পদার্পণ করিল। যাঁহার কৃপায় পত্রিকা সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সুদীর্ঘ কাল দেশের মঙ্গলসাধনে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই ভগবানের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া এই ভিক্ষা প্রার্থনা করি যে, ইহা আরও সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনরূপ উপাসনার ব্রতউদ্‌যাপনে দেশ-বাসীগণের সহায় হউক। পত্রিকার গ্রাহক, পাঠক ও হিতৈষীগণকে আমাদের সাদর অভিবাদন ও অভিভাষণ জানাইয়া পত্রিকার প্রতি তাঁহাদেরও সহৃদয় প্রীতিদৃষ্টি ও কল্যাণকামনা প্রার্থনা করি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ।

যিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি, অমৃতের নেতা, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। তোমরা সর্ব্ব-প্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক-মেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা সর্ব্ব-প্রযত্নে পালন করিবার পক্ষে তিনি তোমাদের সহায় হউন। সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বর তোমাদের সদ্ভাব, সাধুভাব পোষণ করুন; জ্ঞানধর্ম্মে তোমাদিগকে উন্নত করুন; তোমাদের কুল-মর্য্যাদা, মান, সম্ভ্রম, যশঃ-কীর্ত্তি অক্ষত রাখুন এবং এখানে তোমা-দিগকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়া, লোক-লোকান্তরে স্বর্গ হইতে স্বর্গলোকে উন্নত করিয়া অবশেষে আপনার অমৃতানন্দ ক্রোড়ে স্থান দিয়া মোক্ষপদ প্রদান করুন। এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

তোমাদের স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, ব্রহ্মপদ লাভ হউক।

৩২।১৮২১ শক।

ধর্ম্ম কি ?*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গত বৎসরের কথা।

ভগবানের দয়ায় নবশতাব্দীর একটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সুখদুঃখের ভিতর দিয়া, আশা-নিরাশার ভিতর দিয়া, একমাত্র তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় একবৎসর আমরা নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া আসিলাম। গত বৎসরের প্রথম অবধি চারিদিকে যে প্রকার নিরাশা ও নিরানন্দের কারণ-সমূহ নয়নের সম্মুখে সুবৃহৎ আকারে সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা এতটুকু আশা করিতে পারি নাই যে, নবশতাব্দীর প্রথম মাঘোৎসব সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়, এই মন্ত্রের উপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া উৎসবসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সকল বাধা-বিঘ্ন আশ্চর্য্যরূপে প্রতিহত করিয়া দিলেন।

গত মাঘোৎসবের বাণী।

বিগত উৎসবে আমরা যে বাণী লাভ করিয়াছি, তাহা এই—অন্যোন্যসাহচর্য্যে পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া পরস্পরের হাত-ধরাধরি করিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে, উন্নতির পথে, সাধনের পথে, সিদ্ধির পথে—এক কথায় সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অগ্রসর হইলেই জীবনলাভ, পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলেই মৃত্যু সুনিশ্চিত।

প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনের কেন্দ্র।

বর্ত্তমানে দেশবাসীগণ রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। দেশের যেরূপ দুর্দ্দিন আসিয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে অন্নবস্ত্রের সমস্যামূলক যেরূপ হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে, এবং রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির উপর সেই সকল সমস্যার নিরাকরণ যে প্রকার নির্ভর করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা ঐ সকল বিষয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও বুঝি নিতান্ত অন্যায় হইবে না। কিন্তু ঐ সকল বিষয়ই মানুষের সমস্ত নয়। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি প্রভৃতি মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গলের পথে তুলিয়া ধরিতে পারে না। সেই সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের পথে যাহা ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের একএক অংশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্ম মানবজীবনের সমস্তটা পরিপূর্ণ-ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কাজেই রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি বা মানবজীবনের কোন এক অংশে বিধৃত যে কোন নীতিই বল না কেন, তাহা মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বা মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারে না; একমাত্র ধর্ম্মই তাহা পারে; কারণ ধর্ম্মের ভিতরেই সকল নীতির সমাবেশ আছে, এবং সকল নীতির ভিতরেই ধর্ম্মেরও সমাবেশ আছে। বলিতে গেলে, ঐ সকল নীতির এক-একটী মানবজীবনের একএকটী পরিধিমাত্র এবং ধর্ম্মই উহাদের সকলেরই অনন্যকেন্দ্র। কাজেই আমরা যে নীতিরই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করি না কেন, আমাদের দেখিতে হইবে যে, তাহার ফলে কতটুকু সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল সাধিত হইবে; এক কথায়, কতটুকু প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইবে। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির সাধনা করিতে গেলে তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আসা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। আমি এখানে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা মাত্র দেশাচারমূলক ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না; আমি এখানে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আমার বক্তব্য বলিয়া আসিলাম—যে ধর্ম্মের সাধনা মানুষকে কি শারীরিক (material), কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে ঠেলিয়া লইয়া চলে।

ধর্ম্ম জড়জগতেরও কেন্দ্র।

মানুষ তাহার দেহ মন ও আত্মা লইয়াই সংগঠিত। তাহার দেহ মন ও আত্মা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। তাই মানুষের ধর্ম্ম, যাহা প্রকৃত সত্যধর্ম্ম, তাহার দৃষ্টি শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকলের উপর সমানভাবে, অর্থাৎ সকলের সামঞ্জস্যের উপর থাকিতে হইবে। যে ধর্ম্ম কোন একটীকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র অপর একটীকে ধরিয়া থাকিলে চলিবে না।

এই যে জড়-বিজ্ঞান আমাদের শারীরিক (material) উন্নতিবিধানে সহায়তা করিতেছে, ইহার কারণ, যে ধর্ম্ম সমগ্র জগৎকে ধারণ ও পোষণ করে, সেই ধর্ম্মই উহার কেন্দ্রে অবস্থিত। বিজ্ঞান বলিয়া দেয়—কোথায় সূর্য্য, কোথায় চন্দ্র, কোথায় বা অগণিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল, আর কোথায় বা এই পৃথিবী, কোথায় বা এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানবদেহ,—সূর্য্যের মধ্যে তরঙ্গবিক্ষোভ উপস্থিত হইল, আর মানব যে পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে, সেই পৃথিবীতেও নানাবিধ বিক্ষোভ উপস্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র মানবেরও দেহে ও মনে বিক্ষোভ আসিল। চন্দ্রমার জ্যোতির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে এবং এই পৃথিবীতে অবস্থিত মানবেরও দেহে ও মনে নানাবিধ ইতর-বিশেষ দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপে দেখা যায় যে, সমস্ত জড়জগত, মানবদেহ যাহার অন্তর্ভুক্ত,

* ১৮৫৩ শকের নববর্ষ উপলক্ষে।

একই প্রীতিসূত্রে অবলম্বিত হইয়া আছে—একবিধ নিয়মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে।

ধর্ম মনোজগতেরও কেন্দ্র।

মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, সমগ্র জগতের—কে বলিতে পারে, লোক-লোকান্তরের নহে—অধিবাসীগণও একই প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ। এস্থলেও দেখা যায় যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই মানুষের, বোধ হয় জীবজন্তুরও, মনের ভাব ও চিন্তা প্রভৃতি একবিধ নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া চলে। এই কারণে কোথায় হিমতুষারে আচ্ছাদিত সুমেরু কেন্দ্রের অধিবাসী, আর কোথায় প্রচণ্ড রৌদ্র-সন্তপ্ত এই ভারতের অধিবাসী; কোথায় অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসী, আর কোথায় সভ্যতার উন্নত শিখরে আরূঢ় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসী, পরস্পর পরস্পরের মনের ভাবসকল বুঝিবার অধিকার রাখে। যে ধর্ম্ম সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত, সেই ধর্ম্মই সমগ্র মানবপ্রকৃতিরও কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত। এই কারণেই বহির্জগত এবং এই মানবদেহে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় মন, এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসম্বন্ধে সংবদ্ধ। মানবদেহের কথা দূরে থাক,—বহির্জগতে বিক্ষোভ উপস্থিত হইলে মানবেরও মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ভূমিকম্প হইল, জলপ্লাবন হইল, মানবেরও মনপ্রাণ নানাবিধ ভয়ভাবনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। আর ইহাও ত পরীক্ষিত সত্য যে, আহারবিহারের সুবিধা ও অসুবিধার উপর, খাদ্যাখাদ্যের ভালমন্দের উপর, মানব-মনেরও স্বাস্থ্যঅস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এইরূপে দেখা যায় যে, বহির্জগত ও অন্তর্জগত এক আশ্চর্য্য অঙ্গাঙ্গীযোগে আবদ্ধ, এক অন্তর্নিগূঢ় প্রীতিসূত্রে অবলম্বিত।

এই যোগের, এই প্রীতিসূত্রের কারণ অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের উপলব্ধি হয় যে, এই বহির্জগত ও অন্তর্জগতের ভিতর, এক কথায় সমগ্র প্রকৃতির ভিতর এমন এক মহান্ শক্তি অবস্থিত আছে, যাহা কেন্দ্রে থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে সুনিয়মে পরিচালিত করিবার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে। সেই শক্তিই ধর্ম্ম।

জীবাত্মা ও তাহার শক্তি।

আমরা প্রকৃতির কার্য্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারি যে, শক্তি আপনা আপনি আসিতেও পারে না বা নিরবলম্ব হইয়া থাকিতেও পারে না। শক্তি ইচ্ছাময় পুরুষ হইতে নিঃসৃত হয় এবং ইচ্ছাময় পুরুষেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। পুরুষের ইচ্ছা ঐ শক্তির মধ্যে অন্তর্নিগূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিলেও, পুরুষ ঐ শক্তির অতীত ও ঐ শক্তি হইতে পৃথক্। এই পুরুষের ইচ্ছা ও শক্তি আছে বলিয়াই ইহা দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বোদ্ধা না হইয়া যাইতে পারে না। ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত একটী মহান সত্য। অধ্যাত্মবিজ্ঞানে এই ইচ্ছাময় পুরুষই আত্মা বলিয়া অভিহিত হয়। মানবদেহের অন্তরে যে সসীম ইচ্ছাময় পুরুষ থাকিয়া মানবদেহ ও মানব-মনকে পরিচালিত করে, এবং দর্শন, স্পর্শন, মননাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাই সীমাবদ্ধ মানবাত্মা।

প্রকৃতিতে পরমাত্মা।

যে শক্তি সমগ্র প্রকৃতির অন্তরে থাকিয়া সমগ্র প্রকৃতিকে অবিচলিত নিয়মসমূহে পরিচালিত করিতেছে, সেই শক্তি তোমার আমার ন্যায় সীমাবদ্ধ পুরুষ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। সেই শক্তি এই সুবিশাল বিশ্বজগতের স্রষ্টা, পাতা ও নির্ব্বহিতা মহান পুরুষ হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে এবং তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। মানবাত্মা যেরূপ মানবের দেহ ও মনের প্রত্যেক অংশই সমভাবে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা মহান পুরুষও সমগ্র প্রকৃতির অভ্যন্তরে তাহার আত্মারূপে কিন্তু তাহার অতীত ও তাহা হইতে পৃথক্ থাকিয়া তাহার প্রত্যেক অংশই সমভাবে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই মহান সত্য ভারতের তপোনিষ্ঠ ঋষিরা তাঁহাদের বহু যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে উপলব্ধি করিয়া হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে বজ্রনির্ঘোষে বিঘোষিত করিয়াছেন যে—যাশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ; যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—এই আকাশে যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অবস্থিত আছেন; এই আত্মাতে যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অবস্থিত আছেন, সাধক একমাত্র তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য কোন পথ নাই।

পরমাত্মা ও তাঁহার মঙ্গল ভাব।

সেই মহান পুরুষই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং আমাদের উপাস্য দেবতা। এই মহান আত্মাই প্রকৃতির অন্তরে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা ও বিজ্ঞানাত্মারূপে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা; তিনি কেবল ইচ্ছাময় ও শক্তিময় মহান পুরুষ নহেন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্যামী ও মঙ্গলময় বিধাতা। শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে আলোচনা করিলে তাঁহা হইতে নিঃসৃত এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারা প্রকৃতির মধ্যে অনুস্যূত দেখিতে পাইব। বৃক্ষের প্রতি পত্র, বিহগের প্রতি কূজন, পুষ্পের সুগন্ধ ও

সৌন্দর্য্য জগতে সকলই তাঁহার মঙ্গলভাবে ঢলঢল। আমাদের সুখ-সৌভাগ্য যেমন তাঁহার মঙ্গল নিশ্বাস বহন করিয়া আনে, সেইরূপ দুঃখবিষাদের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহারই প্রেম ও মঙ্গলভাবের বিমল জ্যোতিরেখা প্রতিফলিত দেখি।

আত্মাতে পরমাত্মা।

সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে, সেই মহান পুরুষের শক্তির অনুরূপ শক্তিলাভের পথে, এক কথায় ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে চাহিলে, সেই পরম পুরুষ ভগবানেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে হইবে—তাঁহাকেই সকল হৃদয় দিয়া প্রীতি করিতে হইবে এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকিতে হইবে। কেবল বহির্জ্জগতে তাঁহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলে, অথবা বাহিরের পত্রপুষ্প দিয়া তাঁহার পূজা-অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না। প্রত্যেক মানব-আত্মাই তাঁহার শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসন। আত্মাতেই তিনি স্বীয় জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে নিত্য বিরাজমান। সেই আত্মারই অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। ইহা শুধু কথার কথা নহে—ইহা প্রত্যেক সাধকেরই অন্তরের পরীক্ষিত সত্য বাণী।

সত্যধর্ম্মের অনুশাসন।

আমাদের চারিদিকে সুখ ও দুঃখের, আশা ও নিরাশার, আনন্দ ও নিরানন্দের চিরন্তন দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। এই সকল দ্বন্দ্বের মধ্য হইতেই সকল দ্বন্দ্বের অতীত, মৃত্যুর অতীত, আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্যামী মঙ্গলময় পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইতে হইবে। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মিলাইয়া ফেলিতে হইবে। ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর সূর্য্য যেরূপ তাহার কিরণজাল সমভাবে বিস্তার করে, পাপীতাপী, সাধুঅসাধু-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর যেরূপ মঙ্গলময় ভগবানের কৃপাবারি সমভাবে বর্ষিত হয়, আমাদেরও সেইরূপ মঙ্গলময় ভগবানের প্রীতিসাধনের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাঁহারই সৃষ্ট জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত আমাদের হৃদয়-মনকে সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে —পরের সুখে যেমন সুখী হইতে হইবে, পরের দুঃখেও সেইরূপ দুঃখী হইতে হইবে—সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে; অপরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিতে হইবে—অহিংসাসাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত সত্যধর্ম্মের অনুশাসন।

ধর্ম্মসাধনেই প্রকৃত মুক্তি।

আমরা যদি আমাদের যথার্থই উন্নতি চাই, যথার্থই মঙ্গল কামনা করি, তবে আজ অবধি সত্য ধর্ম্মের অনুশাসন দৃঢ়তা সহকারে পালন করিতে হইবে। ধর্ম্মসাধন ব্যতীত মানবের প্রকৃত উন্নতি নাই, প্রকৃত মঙ্গল নাই, প্রকৃত স্বাধীনতা নাই, প্রকৃত মুক্তি নাই। ঐ যে মহাত্মা গান্ধী আজ নবতর ভাবে রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও জগতকে ধর্ম্মের জয় পদে পদে প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন, ইহার মূল কারণ হইল তাঁহার সত্যধর্ম্মের অনুশাসন অবিচ্ছেদে পালন এবং মঙ্গলময় ভগবানের সহিত সর্ব্বদা একাত্মযোগে যুক্ত থাকিয়া তাঁহার প্রতি অবিচলিত আস্থা ও নির্ভর সহকারে সকল কর্ম্ম সংসাধন। যে কোন ক্ষেত্রেই হৌক না কেন, অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কৃতকার্য্য হইতে চাহিলে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের অধিবাসী ধর্ম্মকে ছাড়িয়া চলিতে পারে না; ভগবানের পক্ষপুটতলে বিশেষ-ভাবে আশ্রিত এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি তাঁহাকে ছাড়িয়া একপদও চলিতে পারে না।

ধর্ম্মের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও।

আজ বৎসরের প্রথম দিন। নবজাত শিশুর জন্মদিন যেমন পবিত্র, বৎসরের এই প্রথম দিনও সেইরূপ পবিত্র; তাই আমরা এই শুভ দিবসে মঙ্গলশঙ্খ নিনাদিত করিয়া, মঙ্গল রাগ-রাগিণীতে ভগবানের বন্দনা-গীত গাহিয়া এই নব বৎসরকে সাদরে আবাহন করিতেছি। বৎসরের এই প্রথম দিন অবধিই আমাদিগকে জননীর চরণতলে পৌঁছিবার জন্য সর্ব্ববিধ উদ্যোগআয়োজন করিতে হইবে; বৎসরের এই প্রথম দিন অবধিই আমাদিগকে অমৃতধামের পথে যাত্রা সুরু করিতে হইবে। পরম পিতার সিংহাসন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের যে সুবিস্তৃত ও সরল রাজপথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই সরল পথ ধরিয়া তাঁহারই নামের জয়ধ্বনি করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও— পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। ভগবানের প্রতি যাঁহারা একান্ত নির্ভর ও আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহার সহিত যাঁহারা একাত্মযোগে যুক্ত থাকেন, তিনি স্বয়ংই তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ভার বহন করেন। ভগবান স্বয়ংই দীপ্ত দীপ ধারণ করিয়া এই পথের যাত্রীদিগের অগ্রে অগ্রে চলেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা আমাদিগকে এই সত্যবাণী শুনাইয়াছেন যে, এই সরল পথে আমরা একপদ অগ্রসর হইলে তিনি স্বয়ং আমাদিগকে দশ পদ আগাইয়া দেন। এই সত্য আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়া আমাদের সম্মুখে ভাস্বর আকারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

ভগবানের কৃপাবারিতে সকল ভুলভ্রান্তি ধুইয়া যাইবে—হতাশ হইও না।

অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য আপনাকে নিরাশার সাগরে নিমগ্ন রাখিয়া মুহ্যমান থাকিও না। আমরা সীমাবদ্ধ মানব; আমাদের পক্ষে ভুলভ্রান্তি তো স্বাভাবিক। ভুলভ্রান্তি যদি একটিও না করিতাম, তবে আমরা প্রত্যেকেই তো ভগবানের আসনে সমাসীন হইতাম। ভগবান যখন আমাদের পিতামাতা, তিনি যখন আমাদের মঙ্গলময় বিধাতা, এই অনন্তস্বরূপ পরম পুরুষের দয়ার যখন আদি নাই, অন্ত নাই, তখন আমাদের কোনপ্রকার বিভীষিকায় ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। তাঁহার চরণে যতই কেন অপরাধ করি না, আমরা মোহ বশতঃ আপনাকে পাপে নিমগ্ন রাখিতে চাহি না, সেই অপার করুণাময়ী জননী আমাদের সমস্ত অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন; আমাদের গাত্র হইতে পাপের জ্বালাময় ধূলিকর্দ্দম তাঁহার স্নেহ-হস্তে নিশ্চয়ই মুছিয়া দিবেন। এইজন্যই তো তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিকট দয়াময় পিতা এবং করুণাময়ী জননী। যাঁহার প্রসাদে শরীর ও মন, যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি ও বল, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিতেছি, এস আমরা অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের প্রত্যেকের আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করিবার ব্রত গ্রহণ করি। এস আজ বৎসরের প্রথম দিবস অবধি আমাদের ছোট-বড় সকল কার্য্যে—আমাদের প্রতি নিমেষে, প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, তাঁহারই আসন সর্ব্বোচ্চে স্থাপন করি এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হই। আমাদের সকলের মস্তকে ভগবানের শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

ধর্ম্ম মানবের অন্তর্নিহিত সত্য।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

মানুষ অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, তাহার শক্তিসামর্থ্য সকলই অতি অল্প। কিন্তু মানুষ নিজের অল্পতা লইয়াই পরিতৃপ্ত নহে, সে আপনার বাহিরে যাইতে চায় এবং আপনার অপেক্ষা কোন উচ্চতর শক্তির সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষাই ধর্ম্মের মূল কথা। সকল দেশে এবং সকল কালে কি সুসভ্য, কি অসভ্য সকল অবস্থার লোকই কোন-না-কোন দেবতার পূজা করে। অনেক অসভ্য জাতি এমন সকল দেবতার পূজা করিয়াছে, যাহারা আমাদের দৃষ্টিতে একেবারেই পূজার যোগ্য নহে। কিন্তু প্রত্যেক জাতিই আপনাদের মধ্যে যে সকল গুণের বিশেষ সমাদর করিত, তাহাদের উপাস্য দেবতাতেও সেই সকল গুণ অসীম পরিমাণে আরোপ করিয়াছে। অসভ্য অবস্থাতে আমরা মানবঅন্তরে যে ধর্ম্মভাবের অঙ্কুরমাত্র দেখিতে পাই, ক্রমে সভ্যতার উন্নতিসহকারে সেই ধর্ম্মভাবই ভগবানকে অনন্ত মঙ্গলময় বলিয়া দেখাইয়া দেয়। কিন্তু অসভ্য অবস্থাতে মানুষ যে গাছপালার পশুপক্ষীর ভূতপ্রেতের পূজা করে, তাহা হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মভাব মানুষের একটী স্বাভাবিক মনোবৃত্তি এবং মানবজীবনে ইহার স্থান অতি উচ্চ।

মানুষ আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত নহে, কিন্তু আপনার সীমার বাহিরে যাইতে চায়; সাহিত্য ও ইতিবৃত্তেও আমরা এই আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ দেখিতে পাই। প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবিগণ কাব্যে এবং উপন্যাসে যে সকল আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই সকল চরিত্র কল্পিত হইলেও যে মানবসমাজে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, সে অমরত্বের মূলে মানুষের ধর্ম্মভাব। ইতিহাসবর্ণিত মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ অসামান্য জ্ঞানবুদ্ধি ও শৌর্য্যবীর্য্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা সে জন্য তাঁহাদিগকে যে সম্মান ও গৌরব দান করি, এবং কাহারও কাহারও সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রীতি স্মরণ করিয়া আমরা যে ভক্তি ও আনন্দ অনুভব করি—সেই সম্মান ও গৌরব, সেই ভক্তি ও আনন্দের মূলেও মানুষের ধর্ম্মভাব। মানুষ অনন্তের যাত্রী। যে মহত্ত্ব মানুষের অপ্রাপ্য, তাহার আকাঙ্ক্ষা এবং যে পূর্ণতা মনুষ্যচেষ্টার অতীত, তাহার অনুসরণই ধর্ম্মের প্রাণ। কিন্তু কোন মানুষেই আমরা পূর্ণতার আদর্শ পাই না। ভগবান স্বহস্তে মানবপ্রাণে যে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহাকে লাভ করিলেই সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি।

পৃথিবীতে অনেক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ও এখনও আছে। সকল ধর্ম্মই যে সমান সত্য ও সকলগুলিই যে সমানরূপে মুক্তির সহায়, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। অনেক ধর্ম্ম নিজ নিজ উপাস্য দেবতার চরিত্রে নানারূপ জঘন্যতা আরোপ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এই সকল ধর্ম্ম মিথ্যা। যে ধর্ম্ম যে পরিমাণে ভগবানে পূর্ণতা প্রদান করে, সেই ধর্ম্ম সেই পরিমাণে সত্য ও পবিত্র।

মানুষ যাহা কিছু সৃষ্টি করে, যাহা উদ্ভাবন করে, সকলই অপূর্ণ। শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সকল বিষয়েই

মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে; ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। মানুষ অদ্যাবধি যে পবিত্রতম ধর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়াছে বা ভবিষ্যতে কখনও উদ্ভাবন করিবে, তাহাও অনন্তস্বরূপের পূর্ণমহিমা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা তাঁহাকে যে হৃদয়দর্পণে দর্শন করি, সে দর্পণ কত ক্ষুদ্র ও মলিন! আমরা তাঁহাকে যে বিশ্বে দর্শন করি, সেই বিরাট্ বিশ্বের কত ক্ষুদ্র অংশের সহিত আমরা পরিচিত! আমরা শাস্ত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা পাঠ করি, তাহা ভক্ত বিশ্বাসীগণের আপ্ত-ব্যাক্য হইলেও মানুষের অপূর্ণ ভাষাতেই লিখিত। আমরা তাঁহার যে বাণী অনুপ্রাণনারূপে আমাদের অন্তরে লাভ করি, যাহাতে আমরা সে বাণীকে গ্রহণ করিতে পারি, এজন্য আমাদের ক্ষুদ্র ধারণার উপযোগী করিয়াই তিনি তাহা প্রকাশ করেন। বাল্য-কালে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভগবান সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা থাকে, তাহার মধ্যেও অনেক ছেলেমানুষী থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে যতই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি পরিপক্ক হইতে থাকে ও বিবেকের উন্মেষ হইতে থাকে, ততই আমরা বুঝি যে তিনি রাগদ্বেষের অধীন নহেন, তিনি অজর অমর নিরাকার ও চিন্ময়, তিনি অনন্ত মঙ্গলময় ও পরিপূর্ণ পবিত্রস্বরূপ। আমরা ক্রমশঃ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তাঁহার জ্ঞান ক্রমশঃ আমাদের অন্তরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা কখনই সেই অনন্তদেবের পূর্ণ মহিমা ধারণা করিতে পারি না, এবং তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের যে উচ্চতম চিন্তা তাহাও নির্ম্মল সত্য নহে, তাহাও মানবীয় ভ্রম ও কুসংস্কারের ছায়া হইতে একান্ত নির্ম্মুক্ত হইবার নহে।

ধর্ম্ম যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ভগবানকে লাভ করাই যে মানুষের পরম গতি ও চরম সার্থকতা, মানবপ্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিলে সে সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বুদ্ধি মানবের একটী স্বর্গীয় শক্তি। মানুষ জগতের ঘটনাবলী দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদের কারণ অনুসন্ধান করে। মানুষ স্বভাবতই জানিতে চায় যে, জগতের এই আশ্চর্য্য নিয়ম ও শৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধি বলে যে, জগতের এক চৈতন্যময় স্রষ্টা বা আদিকারণ আছেন। ধর্ম্মের যাহা মূল সত্য, বুদ্ধি মানুষকে সেই সত্য শিক্ষা দেয়। আবার মানুষ প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া মানুষ যখন একএকটী নিয়ম অবধারণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার কত আনন্দ! বিশেষ, মানুষ যখন এমন কোন নিয়মের সন্ধান পায়, সমগ্র বিশ্ব যে নিয়মের অধীন, তখন তাহার আনন্দ আর ধরে না। বিজ্ঞান এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, শিশুহস্তনিক্ষিপ্ত এক-খণ্ড প্রস্তর যে শক্তির দ্বারা পরিচালিত, সেই শক্তিই পৃথিবীকে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিঘূর্ণিত করিতেছে এবং অনন্ত গগনে নক্ষত্রকে নক্ষত্রের সহিত গ্রথিত করিয়াছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যদি একই নিয়মের দ্বারা শাসিত হয়, তবে কি আমরা বলিব না যে বিশ্বরাজ এক এবং অদ্বিতীয়? তবে কি আমরা বলিব না যে যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে ভক্তগণ বিশ্বাসের আলোকে যে সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আলোকেও সেই মহাসত্যেই উপনীত হইয়াছি?

ধর্ম্মের মূল যে মানবঅন্তরে নিহিত আছে, মানুষের বিবেক তাহার আর একটী সাক্ষী। জীবনের প্রতি সঙ্কটে বিবেক আমাদিগকে অতি পরিষ্কার ভাষায় বলে যে "ও পথ নয়, এই পথ; এই পথে ধর্ম্ম আর ঐ পথে অধর্ম্ম।" বিবেকের কথা যখন আমরা অগ্রাহ্য করি তখন আত্মগ্লানি ভোগ করি এবং সুস্পষ্ট অনুভব করি যে, আমাদের উপরে একজন প্রভু ও বিচারক আছেন; বিবেক তাঁহারই বাণী। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন কালে কি সুসভ্য কি অসভ্য প্রায় সকল অব-স্থার লোকই এই সত্য স্বীকার করিয়াছে যে, বিবেক-ব্রহ্মবাণী।

অধর্ম্মকে ঘৃণা করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভা-বিক। মানুষের সহজ বিশ্বাস এই যে ধর্ম্মরাজ ভগবান ধর্ম্মবিধি-অনুসারেই এই জগৎ শাসন ও পালন করিতে-ছেন। যখনই আমরা দেখি যে একটা লোক অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা দ্বারা সংসারে অনেক উন্নতি করিতেছে এবং স্ফীতবক্ষে সদর্পে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। আমরা মনে মনে বলি, "থাক তুমি, যাবে কোথা? তোমার জন্য শাস্তি তোলা আছে!" অনেক সময়ে পাপী ভগবানকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু ভুলিয়া থাকিতে পারে না। তিনি স্বহস্তে মানবঅন্তরে যে ধর্ম্মবিধি লিখিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহা পাপের আবর্জ্জনা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু জীবনের গম্ভীর মুহূর্ত্তে সে লেখা আবার ফুটিয়া উঠে। যে পরিমাণে আমরা বিবেকের অনুবর্ত্তী হই, সেই পরিমাণে ধর্ম্ম আমাদের নিকটে সত্য হয় ও সেই পরিমাণে আমরা ধর্ম্মরাজ ভগবানকে ভক্তি করিতে সমর্থ হই।

মানবঅন্তরে যে সকল সুকোমল বৃত্তি আছে, সেগুলির কথা চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে ধর্ম্ম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। শিশু সর্ব্বপ্রথমে পিতা-মাতাকেই ভালবাসিতে শিক্ষা করে। এই ভাল-বাসাই ধর্ম্মের বীজ। আমাদের আত্মার স্বর্ণসিংহাসনে

অধিষ্ঠিত পরম পিতা ও স্নেহময়ী পরম জননীকে ভালবাসা ও ভক্তি করা ভিন্ন ধর্ম্ম আর কি ? সুতরাং বলিতে হয় যে জীবনের উষাকালে মানুষ যে প্রেমের দীক্ষা লাভ করে, সেই প্রেমেই ধর্ম্মের আরম্ভ এবং ধর্ম্ম সেই প্রেমেরই পরিণতি।

ধর্ম্ম যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক তাহা আর একটী কথা চিন্তা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি। মানবপ্রাণের অন্তরে অনন্তের প্রতি অতি আশ্চর্য্য আকর্ষণ আছে। যাহা কিছু ভূমা, বিরাট, আমাদের ধারণার বহির্ভূত, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, যাহার উপরে অসীমের ছায়া পড়িয়াছে—তাহাই মানুষকে মুগ্ধ করে। এই জন্যই নির্জ্জন অন্ধকার অরণ্য, বিশাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ, উন্মত্ত গভীরনিনাদী জলপ্রপাত, গগনস্পর্শী তুষারকিরীট পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিয়া আনন্দে আমাদের শরীর কণ্টকিত হয়। এই জন্যই অসাধারণ প্রতিভা, দুর্জ্জয় সাহস, অটল প্রতিজ্ঞা, আত্মহারা প্রেম, জীবনব্যাপী অক্লান্ত সেবা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া যাই। "নাল্পে সুখমস্তি" একথা অতি সত্য। যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু পরিমিত, যাহার সহিত আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, জীবনে যাহা আমরা সদাসর্ব্বদা দেখি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তি নাই। মানুষের হৃদয় পূজা করিতে চায়। মানুষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। এই ভক্তিবৃত্তি মানবঅন্তরে এত প্রবল যে, যখন মানুষ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে না পায়, তখন অসাধারণ ব্যক্তিগণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করে ; কিম্বা অসাধারণ শক্তি আরোপ করিয়া নানাপ্রকার দেবদেবীর সৃষ্টি করে। ধর্ম্ম যে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, ভক্তিভাব তাহার প্রমাণ।

আবার মানুষ স্বভাবতই সুন্দরকে ভালবাসে। সৌন্দর্য্যপ্রীতি মানবঅন্তরের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। এই সৌন্দর্য্য সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত একটী আশ্চর্য্য রহস্য। পাহাড়পর্ব্বত নদনদী বনভূমি ও শস্যক্ষেত্র, প্রভাত ও সূর্য্যাস্তকালের বিচিত্র বর্ণের মেঘমালা, দিবাভাগের স্নিগ্ধ নীল আকাশ, নিশীথ অন্ধকারে স্থিরজ্যোতি নক্ষত্ররাজী—বাস্তবিক জগতে সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য প্রকৃতির অতীত যিনি তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়কে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে। জগতের আশ্চর্য্য কৌশলে যত লোক ভগবানের জ্ঞানলীলার পরিচয় লাভ করেন, তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক লোক জগতের শোভাসৌন্দর্য্যে তাঁহার প্রেমলীলা দর্শন করেন।

মানুষের জড় দেহ আছে সত্য, মানুষের কতকগুলি পশুপ্রবৃত্তি আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই ; কিন্তু মানুষ শুধু জড় নহে, শুধু পশুও নহে। সমগ্র জড় জগৎ অচ্ছেদ্য নিয়তির অধীন, সমগ্র পশুরাজ্য প্রবৃত্তির দাস ; কিন্তু মানুষ স্বাধীন, মানুষ চির মুক্ত। মানুষের এই নৈতিক স্বাধীনতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। মানুষের বিবেক (conscience) অনুজ্ঞারূপী—কেবল যে জীবনের সন্ধিক্ষণে কোন্‌টা ধর্ম্মের পথ আর কোন্‌টা অধর্ম্মের পথ বলিয়া দেয় তাহা নহে, কিন্তু অভ্রান্ত ভাষায় আমাদিগকে অধর্ম্মের পথ পরিহার করিতে ও ধর্ম্মের পথে চলিতে আদেশ করে। যখনই আমরা বিবেকের আদেশকে তুচ্ছ করিয়া অধর্ম্মের পথে চলি, অন্তরের তীব্র গ্লানির সহিত কি আমরা স্বীকার করি না যে, ধর্ম্মের পথে যাইবার স্বাধীনতা আমাদের ছিল কিন্তু স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছি ? ইহা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। মানুষ যদি শুধু জড় হইত, যদি শুধু পশু হইত, এই অপূর্ব্ব স্বাধীনতা কখনই তাহার থাকিত না। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহারই আদর্শে গঠিত। তাই ঋষিরা তাঁহাকে বলিয়াছেন "পিতা নোঽসি"। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষ লতা গুল্ম সকলই তাঁহার সৃষ্টি, কিন্তু মানবাত্মায় আমরা তাঁহার যে প্রতিবিম্ব দর্শন করি, অন্যত্র তাহার আভাস মাত্র পাই না।

শিশু ও সঙ্গীত।

(সঙ্গীতভারতী ডাঃ শ্রীবাণী দেবী)

ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদসম্মত যে, সঙ্গীত মানব মাত্রেরই মনোভাব প্রকাশ করিবার অন্যতর প্রকৃষ্ট উপায়। বস্তুত ইহাকে একটী ভাষাবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সঙ্গীত অস্ফুট মনোভাবকে পরিস্ফুট আকার প্রদান করে—ইন্দ্রিয়াতীত ভাবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া দেয়। সঙ্গীতের পূর্ণ বিকাশে আমরা তাহার ভিতর দিয়া এক বিরাট অচেনা অজানা রহস্যময় রাজ্যের সন্ধান পাই ; এবং সেই সঙ্গে এক অনির্ব্বচনীয় অপার আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। আমাদের মনপ্রাণ তখন এক অপূর্ব্ব রসে অভিষিক্ত হয়। সীমাবদ্ধ মানব ক্ষণেকের জন্য ভগবানের অনন্ত অসীম ভাবে আপনাকে হারাইয়া কৃতার্থ করে। মানবহৃদয়ে বহুবিধ ভাব জানিয়া দিবার শক্তি

সঙ্গীত ধারণ করে। মানবের মনোভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে সঙ্গীত একটী অপূর্ব্ব পন্থা।

সঙ্গীত সহজেই আমাদের মনপ্রাণ হরণ করে। বিশেষত কোমলপ্রকৃতি শিশু ও বালকদিগের উপর সঙ্গীত আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম, এবং তাহাদের কল্পনাশক্তির উপর ইহা আশ্চর্য্যরূপ ক্রিয়া করে।

সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থির করিয়া বলা দুরূহ, এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। ইহা ভাষারই ন্যায় পুরাতন—বোধ হয় ভাষা হইতেও প্রাচীনতর। মনে হয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ অবধি সঙ্গীত জন্মলাভ করিয়াছে—নির্ঝরণীর কুলুকুলু ধ্বনিতে, অরণ্যে বৃক্ষরাজির বিকম্পনে, বিহগদিগের কূজনকাকলীতে গ্রহতারকার নীরব গতিতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গীত অহর্নিশ অনুক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির এই সঙ্গীতের প্রতি নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলে ইহার অন্তরে ছন্দ, তাল, বা লয়ের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। বোধ হয় সেই কারণে অনেকের মতে ছন্দ, তাল বা লয় হইতেই সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি। আদিম-মানব ছন্দের ভিতরেই সঙ্গীতের ধ্বনি প্রথম শুনিতে পায়। এই ছন্দের রেশ তাহার হৃদয়দুয়ারে যে প্রথম আঘাত করিল ও মনপ্রাণ হরণ করিল, সেই অনুভূতি হইতেই ক্রমশঃ সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

অনেকের মতে একই সুরের বা একই তালের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতেই সঙ্গীতের বোধ প্রথম বিকশিত হয়। সভ্যতার আলোক যখন প্রথম উন্মেষ লাভ করিয়াছে, তখন হয় ত আদিম মানব সমুদ্রকূলে বেড়াইতে বেড়াইতে দুইটী শামুকের খোলা কুড়াইয়া ঠোকাঠুকি করিতে করিতে যে ছন্দোময় ধ্বনি প্রাপ্ত হইল, তাহাতে সে অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিল। ক্রমে সে একদিন তাহার নিজেরই অজ্ঞাতসারে ফাঁকা শামুক বা শূন্যগর্ভ অন্য কিছুর মুখে শুষ্ক চর্ম্ম লাগাইয়া তাহার উপর আঘাতের ফলে যে আওয়াজ শুনিতে পাইল, তাহাতে সে নিজেই অবাক হইয়া গেল। ইহাই বোধ হয় ঢাক-ঢোল প্রভৃতির উৎপত্তির মূল। হস্ত অথবা শুষ্ক হাড় বা কাষ্ঠখণ্ড দুইটির পরস্পরের আঘাতের ফলে যে শব্দ নির্গত হইল তাহা হইতেই ক্রমে তালের সৃষ্টি হইল। ইহারই অনুকল্পে দুই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা তাল দেওয়া আজও নিম্নশ্রেণীর মানবদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

ছন্দ বেতালা না হইলে উহা বিনা সুরসংযোগেও আমাদের প্রাণে এক প্রকার উন্মাদনা আনিতে সক্ষম দেখা যায়। কীর্ত্তনে খোলবাদ্য ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয়স্থল। ইহা তো জানা কথা যে, দামামার ছন্দোবাদ্যের সহিত এই প্রকার উন্মাদনার কারণেই তালে তালে পা ফেলিয়া চলা কত সহজ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের কর্ণ যে কেবল সুরের জন্যই উৎকর্ণ থাকে তাহা নহে, আমাদের প্রাণে আনন্দ দান করিতে ছন্দোময় বাদনও যথেষ্ট। সেইরূপ মানুষের সুতান কণ্ঠসঙ্গীতেরও উৎপত্তির মূল বোধ হয় সুকণ্ঠ বিহগদিগের শিশ প্রভৃতি এবং পার্ব্বত্য বাঁশে বায়ুর আঘাতে নির্গত বংশীধ্বনির অনুকরণ।

মানব যতই সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল, ততই তাহার অন্তরে তালমানের এবং সুতান কণ্ঠসঙ্গীতের অনুভূতি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে সে তাল, লয় ও কণ্ঠসঙ্গীতের মিলনসাধনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের যথাযুক্ত মিলনের ভিত্তিতেই বর্ত্তমান উন্নত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। এই উন্নত সঙ্গীতই মানবের মনপ্রাণ হরণ করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সুরের অভাবেও সাঙ্গীতিক মাধুর্য্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। খোল বা মাদলের উপর একই বোল যখন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ক্রমাগত বাজান হয়, তখন তাহা হইতে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠে, তাহার লহরী আমাদের প্রাণে আসিয়া স্পর্শ করে এবং আমাদিগের মনপ্রাণকে স্পন্দিত করিয়া তোলে। আমরা জানিনা যে কোন্ এক অজানা ক্ষণে ছন্দোময় তাল ও সুস্বরলহরীর পরস্পর সমাবেশের ফলে উন্নত সঙ্গীতের জন্ম লাভ হইল। কিন্তু বলা বাহুল্য সঙ্গীতের সেই আদিম কালে তালেরও বিভিন্নতা প্রকাশ পায় নাই এবং স্বরসমাবেশেরও বিভিন্নতা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে কোল সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গীতের প্রণালী দেখিয়া মনে হয় যে, সেই আদিমকালেও কি তাল, কি সুর, উভয়েতেই একটা একঘেঁয়ে ভাব বিদ্যমান ছিল।

তাল ও সুরের সমাবেশের ফলে মানবহৃদয়ে যে সঙ্গীত বিকশিত হইল, সেই সঙ্গীত অবলম্বনে মানব স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিবার একটি সুন্দর পন্থা আবিষ্কার করিল—সে তাহার উদ্বেলিত ভাবরাশি ব্যক্ত করিবার সুগম পথের সন্ধান পাইয়া বাঁচিয়া গেল। কালে সে মৃতদেহ হইতে প্রাপ্ত নাড়িভুঁড়ি হইতে প্রস্তুত তাঁতের সাহায্যে এবং তাহারও পরে ধাতুনির্ম্মিত তারের সাহায্যে বাদ্যযন্ত্রনির্ম্মাণে প্রয়াস পাইল। তারের নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রে নানাবিধ সুবিধা থাকায় উহারই সমধিক প্রচলন হইল। যথাসময়ে আকারে প্রকারে ও গঠনপ্রণালী প্রভৃতিতে বাদ্যযন্ত্রের বহুল উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল।

দেশ কাল ও অবস্থাবিশেষে সঙ্গীত দুই বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইহা রাগ-রাগিণীর আকারে এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে স্বরসম্বাদের আকারে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিল। সঙ্গীতের আদিম কালের স্বরলব্ধি বা বিভিন্ন স্বরের সামান্যরূপে একত্র সমাবেশ স্বরসম্বাদের উৎপত্তির মূল কারণ হইলেও স্বরসম্বাদ সঙ্গীতরাজ্যে যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। এই স্বরসম্বাদ সঙ্গীত-ভাণ্ডারের প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, ইহা সঙ্গীত-রাজ্যে নবপ্রেরণা ও নিত্য নব সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিয়া দিল।

পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, একএকটী জাতির এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরে সঙ্গীতের একএকটী বিশেষ ধারা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমাদের মনে হয়, এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গীতের অপরাপর ধারাও যে বর্জ্জন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমাদের দেশে রাগরাগিণীমূলক সঙ্গীতই সমধিক বিকাশলাভ করিয়াছে। এই কারণে ইহা এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গীতে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবন ফুটা-ইয়া তুলিতে চাহিলে আমাদের দেশের শিশুদিগের প্রাণে সঙ্গীতের উন্মেষ অবধি প্রধানত এই রাগরাগিণীমূলক সঙ্গীত অবলম্বনেই সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে শিশু বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠে, তাহার মন পবিত্রতার সৌন্দর্য্যে সুন্দরভাব ধারণ করে। সঙ্গীত উপলব্ধি করিবার শক্তি প্রত্যেক মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত একটী অমূল্য দান। শিশুর অন্তরে সেই শক্তি বিকশিত করিয়া তোলাই প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য। এই কার্য্য সামান্য নহে, কিন্তু গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। শিশুর অন্তরে এই শক্তি ধরিতে পারা এবং সময়ে তাহা ফুটাইয়া তোলা অত্যন্ত ধীরতার সহিত সুদীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ইহার প্রতি অন্তরের অনুরাগ থাকা আবশ্যক।

শিশু যখন হাতে তালি দিয়া তালে-বেতালে নাচিতে থাকে এবং কণ্ঠ হইতে নানাবিধ সুর বাহির করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার ভিতরে শিশুপ্রাণের সঙ্গীত ব্যক্ত করিবার প্রচেষ্টা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। অনেক পিতামাতা শিশুর এইরূপ প্রচেষ্টার কারণে বিরক্তিবোধ করেন এবং শিশুকে এরূপ কার্য্য হইতে ভর্ৎসনাদি করিয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এভাবে শিশুর ঐ প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ না করিয়া উহাকে সুনিয়ন্ত্রিত আকারে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। তবেই উত্তরকালে সংসারে ঐভাবে গঠিত শিশুদিগের দ্বারা সুখশান্তিলাভের আশা সফল হইবে বলিয়া মনে করি। ঐভাবে গঠিত শিশুদিগের ভিতর হইতে তানসেন, আমীর খসরু প্রভৃতির ন্যায় গুণায়কের আবি-র্ভাব হইলে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কারণ হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, যে পরিবারে বংশানুক্রমে সঙ্গীতের চর্চ্চা না থাকে, সেই পরিবারের শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার চেষ্টা নিরর্থক। ইহা সত্য বটে যে, পুরুষানুক্রমে পরিবারে সঙ্গীতচর্চ্চা থাকিলে শিশুদিগের পক্ষে সঙ্গীতশিক্ষার পথ সুগম হয়। কিন্তু তাই বলিয়া পরিবারে সঙ্গীতচর্চ্চার অভাব থাকিলে যে সেই পরিবারের শিশুদিগের সঙ্গীতসাধনা সফল হইবে না, তাহা মনে করা সঙ্গত নহে। সঙ্গীতসাধনায় সিদ্ধি-লাভ বংশানুগত চর্চ্চা অপেক্ষা সঙ্গীতশিক্ষকদিগের উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং ছাত্রদিগের উপযুক্ত সাধনার উপর অধিকতর নির্ভর করে।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শিক্ষাবিভাগের মাননীয় ডিরেক্টার মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-তালিকায় সঙ্গীতশিক্ষা অন্যতর বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেই কারণে বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বনিম্নশ্রেণী হইতেই সঙ্গীতশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

শিশুশিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়েই দূরদর্শিতা ও অভি-জ্ঞতা আবশ্যক। শিশুগণের প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষাও ইহার ব্যতিক্রম-স্থল নহে, কিন্তু শিশুদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা-দান অতিশয় ধৈর্য্য ও বহু পরিশ্রমসাপেক্ষ। শৈশবে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, উত্তরকালে তাহারই ফল দেখা যাইবে—সময়ে তাহার উৎপাটন বা পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য, ইহা স্মরণ রাখিয়া শিশুদের প্রাথমিক সঙ্গীত-শিক্ষাদানে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাদাতাকে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক যত্নসহকারে বারি সিঞ্চন করিয়া শিশুর কোমল প্রাণে সঙ্গীত অঙ্কুরিত করিতে হইবে; নচেৎ পরিণামে উত্তর-কালে শিশুর অন্তরে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব আসা অসম্ভব নহে। সঙ্গীতের শিক্ষাক্রম ও প্রণালী যাহাতে হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তবেই শিশুর অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত সঙ্গীতানু-রাগ সহজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে এবং যাহার অন্তরে সঙ্গীতপ্রীতি নাও দেখা যায়, তাহারও অন্তরে সঙ্গীত-শিক্ষার বাসনা জাগিয়া উঠিবে।

শিশুদিগের অন্তরে সঙ্গীতসাধনার প্রতি অনুরাগ জন্মাইতে চাহিলে শিক্ষাপ্রণালী কঠোর হইবার পরিবর্ত্তে

কোমল হওয়া আবশ্যক। সঙ্গীতশিক্ষার প্রারম্ভে শিশুকে তাহার ইচ্ছানুরূপ আশ মিটাইয়া গাহিতে দিবে; যখন তাহার নিজস্ব গানের উৎস নিঃশেষিত হইবে, তখন তাহার নিকট দুইএকটি সহজ সুর গাহিয়া শিক্ষকের সুরের সহিত সুর মিলাইতে প্রোৎসাহিত করিবে। ক্রমে তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিশুজনোচিত দুইএকটা সহজ তাননিবদ্ধ সুর শিক্ষা করাইবে। অনেকের মতে প্রথম অবধি সহজ তালের গানের সঙ্গে দুইএকটা ধ্রুপদ শিখাইলেও ভাল হয়।

প্রথম অবধি বেসুরা হইতে "ঠিক" সুরের প্রভেদ ও তারতম্য বুঝাইবার চেষ্টা করা উচিত। শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষা সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার বিষয় এই যে, তাহাদের শিক্ষণীয় গানগুলি নিতান্ত একঘেঁয়ে বা কাটখোট্টা ধরণের যেন না হয়। শিশুদিগের সঙ্গীত-শিক্ষা পদ্ধতিতে গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন না করিয়া যাহাতে উহা তাহাদের রুচিকর ও চিত্তাকর্ষক হয়, সেই-দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সঙ্গীতশিক্ষা শিশুদিগের হৃদয়গ্রাহী হওয়া আবশ্যক। এই কারণে শিশুদিগের মনস্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ শিক্ষকের হস্তে শিশুদিগের সঙ্গীত শিক্ষার ভার সংন্যস্ত করা বিধেয় নহে। এরূপ শিক্ষক শিশুদিগের অন্তরে সঙ্গীতশিক্ষায় বিরাগই উৎপাদন করিবেন মনে হয়। শিশুদিগের সঙ্গীতশিক্ষকের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে ধৈর্য্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম অবধি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সূক্ষাতিসূক্ষ্ম নিয়মকানুনের পরিবর্ত্তে সহজ সরস সুরের সহিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে গিয়া অনেকের মনে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, কত বয়সে শিশুর অন্তরে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়; এবং তাহার কত বৎসর বয়স অবধি সেই সঙ্গীতানুরাগ ফুটাইয়া তুলিতে আমাদের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে শিশুসাধারণের জন্য কোন একটা বিশেষ নিয়ম স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সঙ্গত বা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক্ পৃথক্ সময় নির্দ্দিষ্ট করা উচিত; কারণ বিভিন্ন শিশুর অন্তরে ভগবন্নিহিত সঙ্গীতবৃত্তি বিভিন্ন সময়ে প্রথম বিকশিত হইতে দেখা যায়।

শিশুর অন্তরে সঙ্গীতের প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকিলে তাহা বৎসর তিনচার বয়সের মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতে চাহে, দেখা যায়। কি ভারতে কি পাশ্চাত্য দেশে শৈশবেই সঙ্গীতপ্রতিভার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইতে পারে। এই সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, একটি তিনচার বৎসরের শিশু ওস্তাদের গানের সহিত বাঁয়া-তবলার সঙ্গত লাগাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করিতেছে। আমাদের যোড়াসাঁকোর বাটীতে বাপ, জ্যেঠা প্রভৃতিদের মধ্যেও তিনচার বৎসর বয়সেই সঙ্গীতানুরাগ বেশ একটু বিকশিত হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতেও আটদশ বৎসরের একটি বালক সুশিক্ষিত ওস্তাদের ন্যায় বেহালা বাজাইয়া হাজার হাজার লোককে মুগ্ধ করিতেছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতানুযায়ী

আকারমাত্রিক স্বরলিপিপদ্ধতি ও চিহ্নের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন। এই সাতটী স্বর একত্রে মিলিত হইয়া একটা সপ্তক গঠিত হয়। এতদ্দেশীয় সঙ্গীতে সাধারণতঃ তিনটী সপ্তকের ব্যবহার আছে; যথা—উদারা (নিম্ন) মুদারা (মধ্যম) তারা (উচ্চ)। উদারা সপ্তকের চিহ্ন,—স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ্, ন্। মুদারা সপ্তকের চিহ্ন—স, র, গ, ম, প, ধ, ন। তারা সপ্তকের চিহ্ন—র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন।

২। উক্ত সাতটী স্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটী স্বরে কোমল ও কড়ি, অর্থাৎ বিকৃত ভাব আছে। যথা—

কোমল র = ঋ; কোমল গ = জ্ঞ; কোমল ধ = দ; কোমল ন = ণ; কড়ি ম = হ্ম।

৩। স্বর উচ্চারণের সময় কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। গানবিশেষে গতি দ্রুত, মধ্য, কিম্বা বিলম্বিত হইয়া থাকে। এক, দুই, তিন, চার এই কয়টী সংখ্যা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একএকটী করতালি দিয়া মাত্রার গতি স্থির করিয়া লওয়াই সহজ উপায়। ইহাকেই মাত্রার মধ্যগতি বলা যায়।

৪। মাত্রা = া (আকার) যথা:—সা একমাত্রা; সা-া, দুই মাত্রা; সা-া-া তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটী স্বর এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটী স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরে আকার বসে, যথা:—সরা, গরা, ইত্যাদি। এরূপ স্থলে প্রতি স্বরটী অর্দ্ধমাত্রা। এইরূপ এক-মাত্রার মধ্যে তিনটী স্বর উচ্চারিত হইলে সরগা; প্রত্যেক স্বর একতৃতীয়াংশ মাত্রা। এক মাত্রার মধ্যে চারিটী স্বর উচ্চারিত হইলে সরগমা প্রত্যেক স্বরটী সিকি মাত্রা। এইরূপ এক মাত্রার মধ্যে যতগুলি স্বরই উচ্চারিত হউক না কেন, যথা সরগমপা, সরগমপধনা, ইত্যাদি; প্রত্যেক স্বর সমান অংশে বিভক্ত ইহাই বুঝিতে হইবে।

৫। অর্দ্ধমাত্রার বিশেষ চিহ্ন =ঃ; যথা—সাঃ, রাঃ, ইত্যাদি। কিন্তু সাঃ=দেড় মাত্রা, অর্থাৎ আকার এক মাত্রা এবং বিসর্গ অর্দ্ধমাত্রা, উভয়ে মিলিয়া দেড় মাত্রা। সাঃ রাঃ=দুই মাত্রা। অর্থাৎ সাঃ দেড়মাত্রা, এবং রাঃ=অর্দ্ধমাত্রা লইয়া দুই মাত্রা।

৬। যখন কোন আনুসঙ্গিক স্বর কোন প্রধান স্বরকে স্পর্শ করিয়া যায়, তখন ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিতে হয়, যথা—সরা, সারে ইত্যাদি। ইহাকে স্পর্শ-স্বর বলা হয়।

৭। কতকগুলি মাত্রার সমষ্টির নাম তাল। তাল নানাবিধ যথা:—কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, যৎ, ধামার ইত্যাদি। এই সকল তালের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, যে সকল তাল সমভাগে বিভক্ত তাহারা সমপদী যথা:—কাওয়ালী, একতালা, চৌতাল ইত্যাদি। এবং যে সকল তালের ভাগ সমান নহে তাহারা বিষম-পদী যথা:—যৎ, ধামার ইত্যাদি। তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২´, ৩, ৪, ০, ইত্যাদি সংখ্যা চিহ্নিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাগেই একটী করিয়া সম এবং এক দুই কিম্বা ততোধিক ফাঁক আছে। "০" চিহ্নিত "ফাঁক" এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে রেফ্ চিহ্ন থাকে তাহাই "সম"। প্রত্যেক তাল-বিভাগেই এমন একটী স্থান আছে যেখানে বিশেষ একটা ঝোঁক পড়ে। যেখানে ঐ ঝোঁকটী পড়ে, সেই স্থানটিকেই "সম" কহে।

৮। প্রতি তাল-বিভাগের পর এইরূপ "।" ছেদ চিহ্ন বসে; এবং তালের এক আবর্ত্ত অথবা ফের পূর্ণ হইলে "I" স্তম্ভ চিহ্ন বসে।

৯। আস্থায়ীর প্রারম্ভে, যেখান হইতে রীতিমত তাল আরম্ভ হয় সেইখানে ও প্রত্যেক কলির শেষে এইরূপ "II" যুগল স্তম্ভচিহ্ন বসে এবং যেখানে গান ও গৎ এককালীন শেষ হয় সেইখানে এইরূপ "IIII" দুই যোড় স্তম্ভচিহ্ন বসে। আস্থায়ীর আরম্ভে এইরূপ যুগল স্তম্ভ চিহ্নের বাহিরে গান ও গতের যে অংশটুকু লিখিত হয়, তাহা কেবল গান ও গৎ ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিতে হয়, উহা আর দ্বিতীয় বার গাহিতে হয় না। কারণ প্রত্যেক কলির শেষে ঐ অংশটুকু এইরূপ " " কোটেশন চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

১০। { }=পুনরাবৃত্তির চিহ্ন যথা:—{সা রা গা মা} অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১১। ( )=পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের চিহ্ন। যথা:—
{ সা রা (গা মা) } পা ধা। অর্থাৎ সা রা গা মা এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সময় (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া একেবারে "পা ধা" এই অংশ ধরিতে হইবে।

১২। পুনরাবৃত্তিকালে যে স্থানে স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই স্থানে পরিবর্ত্তিত স্বর পূর্ব্ব স্বরের মাথার উপর এইরূপ [ ] ব্রাকেটের মধ্যে স্থাপিত হয়। যথা:—
[রা গা মা]
সা রা গা। কোন একটী কলি শেষ করিয়া আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার সময় যখন আস্থায়ীর কোন কোন স্বরের পরিবর্ত্তন হয়, তখন পরিবর্ত্তিত স্বর পূর্ব্বোক্তরূপে এইরূপ [ ] ব্রাকেটের মধ্যে লিখিত হয়, এই কলির শেষে যে এইরূপ "II" স্তম্ভ চিহ্ন থাকে, উহার মধ্যেও এইরূপ ব্রাকেট চিহ্ন বসে; যথা:—"[ ]" ইহাতে এই বুঝায় যে আস্থায়ীতে গিয়াই কোন পরিবর্ত্তিত স্বর গাহিতে হইবে।

১৩। সাধারণতঃ যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয়; যদি কোন স্থানে উহার প্রত্যেক স্বর পৃথক করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল স্বরের শিরোদেশে বিন্দুচিহ্ন দেওয়া থাকে। যথা—
সঁ রঁ গঁ মঁ। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকে, যথা:—ন পা ইহাকে মিড় বলে।

১৪। স্বরবর্ণ অবলম্বনে সুরের টান চলে, তাহাকে "আশ" বলে। আশের চিহ্ন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে ছোট ছোট কসি অর্থাৎ হাইফেন থাকে। যখন স্বরের নীচে অক্ষর না থাকে তখন স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন চিহ্ন বসে; এবং গানের পংক্তিতে শূন্য (০) চিহ্ন দেওয়া হয়; যথা:—সা -া -া -া অথবা সা-রা-গা-মা ইত্যাদি।
তু ০ ০ ০ তু ০ ০ ০

১৫। স্বরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতার নাম বিরাম। বিরামের চিহ্ন হাইফেন (-) বর্জ্জিত আকার যথা:—
। । । -। যেস্থানে হাইফেন-বর্জ্জিত এইরূপ "।" মাত্রা চিহ্ন যতগুলি থাকিবে, সেই স্থলে সেই কয়মাত্রা থামিয়া আবার তাহার পরবর্ত্তী স্বর অনুসারে গাহিতে হইবে। এরূপ স্থলে স্বরের বিরাম হয় কিন্তু মাত্রার গতির বিরাম হয় না।

১৬। আস্থায়ীর যে পর্য্যন্ত গাহিয়া অপর কোন কলি আরম্ভ করিতে হয়, সেই স্থানের শিরোদেশে "॥" যুগল দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া হয়। যথা:—সা রা গা মা (মা-র উপর ॥)

১৭। একই রকম স্বরের দুই কিম্বা ততোধিক কলি থাকিলে কেবলমাত্র প্রথম কলিতে স্বর, তাল, মাত্রা ইত্যাদি বসাইয়া অপর কলিগুলি তাহার নিম্নে যথাক্রমে লিখিত হইয়া থাকে। এবং উহাতে (১) (২) (৩) ইত্যাদি এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়।

১৮। অন্তরা গাহিবার পর যেরূপ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়, সঞ্চারী গাহিবার পর আর সেরূপ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয় না; সঞ্চারীর পরে আভোগ গাহিয়া শেষে আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইতে হয়। এইজন্য সঞ্চারীর শেষে আর কোন স্তম্ভচিহ্ন না দিয়া একেবারেই আভোগের শেষে এইরূপ "IIII" দুই যোড় স্তম্ভচিহ্ন দেওয়া হয়।

১৯। ছন্দঘটিত যে কোন শ্লোক অথবা কবিতা হউক না কেন, সকলেরই যেমন চারিটি করিয়া চরণ থাকে তেমনি গানেরও প্রায় চারিটি করিয়া চরণ থাকে অথবা কলি থাকে। প্রথম যে কলিটী থাকে তাহার নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা, তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী, এবং চতুর্থ কলির নাম আভোগ।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বেহাগ—ঠুংরী।

উজল মধুর চাঁদিনী যামিনী হৃদয় হারিণী
শোভায় ছেয়েছে সারা ধরণী।
দেখিয়া দেখিয়া মধুর গগনে চাহে না ফিরিতে বিভোর নয়নে
একি যে আনন্দ ভরেছে ভুবনে।
নারি গো রাখিতে বাঁধি চিত মনের শোভায় ছেয়েছে সারা ধরণী॥
ঝুরু ঝুরু বহে মলয় পবনে শ্রান্তি ক্লান্তি দূরি' আনে জাগরণে
চারিদিকে আজি খেলিছে জীবনে তব প্রেমবাণী বাজে অনুক্ষণে
দুঃখ শোক গাথা পশে না মরমে নমি নত শিরে
হে মোর জননী শোভায় ছেয়েছে সারা ধরণী॥

গান ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

II সা সা গা মা। গা মা পা পা I না পা না না। র্সা র্সা র্সা র্সা I
উ জ ল ম ধু র চাঁ দি নী যা মি নী হৃ দ য় হা

I -া না ধপা -পা। -া মা গা -া I গা গা -া গা। গা মা পক্ষা পক্ষা I
• রি ণী• • • • • • শো ভা য় ছে য়ে ছে সা• রা•

I পগা গমা -মপা মা। গা -া রসা -সা II
•• ধ• •• র ণী • •• •

II{ পা পা পা পা। না -া না -া I র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা না র্রর্সা -র্সা I
দে খি য়া দে খি • য়া • ম ধু র গ গ • নে• •

I র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা -া র্সর্রা র্সর্সা I না না নধা পক্ষা। পা র্সা না -া } I
চা হে না ফি রি • তে• •• বি ভো র• ন• য়া • নে} •

I র্মা র্মা র্গা র্গা। র্গা -া র্গর্মা র্পা I র্গা র্পা র্মা র্মা। র্গাঃ র্রঃ র্সা -া I
এ কি যে আ ন • ন্দ• • ভ রে ছে ভু ব • নে •

I পা না র্সা না। ধমা -া ধপা -পা I গা মা পা মা। গাঃ রঃ সা -া I
না রি গো রা খি • তে• • বাঁ ধি চি ত ম • নে •

I ন্া ন্া -পা ন্া। সা সা গা গা I -া গমা -পা মা। গা -া রসা সা II
শো ভা য় ছে য়ে ছে সা রা • ধ• • র ণী • ••

I { সা সা সা সা । সা -া সরা সন্‌া I -ন্‌া সসা গা মা । পা -ক্ষা পা -া I
ঝু রু ঝু রু ব • হে॰ •• • মল য় প ব • নে •

I সা -পা পা পা । -ক্ষা পা মা গা I -া গমা পা মা । গাঃ রঃ সা -া } I
শ্রা • স্তি হ্রা • স্তি দূ রি • আনে জা গ র • শে •

I { পা পা না না । না -া না -া I গা মা পা না । র্সাঃ নঃ র্রর্সা -র্সা I
চা রি দি কে আ • জি • খে লি ছে জী ব • নে॰ •

I র্সা র্সা র্সা র্সা । না -া ধপা -পা I -া ক্ষপা না ধা । র্সা -া না -া } I
ত ব প্রে ম বা • নী॰ • • রাজে আ ন ন্দ • শে •

I র্সা র্সা র্গা র্গা । র্গা -া র্গা -া I র্গা র্মা র্পা র্মা । র্গাঃ র্রঃ র্সা -া I
দু খ শো ক গা • থা • প শে না ম র • মে •

I পা পা না র্সা । না -া ধপা পা I গা মা পা মা । গাঃ রঃ সা -া I
ন মি ন ত শি • রে॰ • হে মো র জ ন • নী •

I গা গা -া গা । গা মা পক্ষা পক্ষা I পগা গমা মপা মা । গা -া রসা সা IIII
শো ভা য় ছে য়ে ছে সা॰ রা• •• • ধ • • • র নী • • • •

ইমন কল্যাণ—ঠুংরী।

এস দেবাধি দেব চিদাকাশে এস,
আকুল বসি হেথা মরমে বহি ব্যথা, লহ লহ জননী মোরে কোলে টেনে এস।
সব চলে যায় ছেড়ে মৃত্যু রহে ঘরে কেড়ে,
হতাশ পরাণে ঘেরে অশ্রু ঝরে নয়নে
সহিতে গো আর্ পারিনে মুকতি দাও দাও হে, আঁকড়ি ধরিতে দাও হে।
তোমারি গো চরণে দুঃখী দীন জনে এস॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সা সা II { সা পা পা পা । ধপা ক্ষা গা -া I রগা রা গা মা । গা রগা রা সা } I
এ স দে • বা ধি দে • ব • চি • দা কা শে •• এ স

I ন্‌া রা রা গা । গা গা গা -া I ন্‌া রা গা ক্ষগা । ক্ষা ধা পা -া I
আ কু ল ব সি হে থা • ম র মে ব• হি ব্য থা •

I ক্ষা ধা না র্সা । না ধা পা ক্ষা I গা রা গা মা । গা রা ন্‌া রা II
ল হ ল হ জ ন নী মো • রে কো লে টে নে এ স

১´ ০ ১´ ০
I পা পা পা পা । পা -া পা পা I ক্ষা ধা পা পা । ক্ষা গা পা রা I
স ব চ লে যা য় ছে ড়ে মৃ ত্যু শ হে য বে কে ড়ে

১´ ০ ১´ ০
I গা ক্ষা পা ধা । নর্সা না ধা পা I পা রা গা মা । গা মগা রা সা I
হ তা শ প রা • ণে ঘে রে অ • শ্রু ঝ রে ন য় নে

১´ ০ ১´ ০
I সা রা গা ক্ষা । ক্ষা পক্ষা পগা -া I গক্ষা পধা নর্সা র্সনা । ধপা -পা -া -া I
স হি তে গো আ •• •• র্ পা• •• •• রি নে • • • •

১´ ০ ১´ ০
I পা ক্ষা ধা পা । র্সা -া -া -া । পধা নর্সা র্রর্গা র্রা । নর্রা র্সর্সা -া -া I
মু • ক তি দা • • ও দা• •• •• ও হে• •• • •

১´ ০ ১´ ০
I না র্রা র্গা র্রা । না র্রা র্সা -া I নর্রা র্সনা ধা না । র্সর্সা নধা পক্ষা পা I
আঁ ক ড়ি ধ রি • তে • দা• •• • ও হে• •• •• •

১´ ০ ১´ ০
I পা নধা না র্সা । না ধা পা ক্ষা । গা রা গা মা । গা মগা রা সা II II
তো মা• রি গো চ র ণে • দু খী দী ন জ নে এ স

রামকেলী—আড়াঠেকা।

হৃদে ধর প্রাণের সে দেব দয়াময়
অন্য কথা ছাড়ি দাও সদা তাঁরি কথা কও
সবে দেখ তাঁরি ছায়া ভেবোনা এ সবি মায়া
আনন্দেরি কণা হতে সৃজন বিলয়।
নামে তাঁর উছসিয়া উঠুক সবার হিয়া
দুখ শোক ক্ষয় হোক দূর হোক ভয়
না করি তার নাম গান পূর্ণ হোক সর্ব্ব কাম
রম তাঁহার চরণ্ ধরি হও রে নির্ভয়।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

৩ ১´ ২ ০
মা II {মণদা -াণ দপা পমা I মপমা মা -া পগা । মগা মঋা ঋা সা । -া -া -া মা ।
হৃ দে• • ধ • র• প্রা• ণে • •• •• •• র সে • • • দে

৩ ১´ ২ ০
। মগা মা পা -া I দা -া -া পা । গা -া দপা দপা । (মপমা গা মগা মা)} ।
ব• দ য়া • ম • • • • • য়• •• •• • •• হৃ

• ৩ ১´ ২ •
। [ম]পমা গা -া দা । দা দা র্সা না I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । [ন]দা -া পা পা ।
•• • • অ ন্য ক • থা ছা ড়ি • • • • দা• • ও • • স

৩ ১´ ২ •
। দা [প]ণদা দা পা I পা পণা [ন]দা -া । -া পা [প]দপা দপা । [ম]পমা গা মগা মা II
দা তাঁ• রি • ক •• থা • • ক ও• •• • • • •• "অ"

৩ ১´ ২ • ৩
II দা । {দা দা র্সা না I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । র্সা -া -া দা । দা না র্সা র্সা I
স বে দে • থ তাঁ রি • • • • ছা• • ধা • • ভে বো না • এ

১´ ২ • • ৩
I র্সা র্ঋা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । ([ন]দা -া -া দা)} । [ন]দা -া -া দা । দা দা র্সা না I
স বি • • • • মা• • ধা • • স ধা • • আ ন ন্দে • রি

১´ ২ • ৩
I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । [ন]দা -া পা পা । দা [প]ণদা দা পা I
ক ণা • • • • হ• • তে • • স্ব জ ন• বি •

১´ ২
I দা -া -া পা । ণা -া দপা দপা । [ম]পমা গা মগা মা II
জ • • • • • য়• • • •• • •• "অ"

৩ ১´ ২ ৩
II সা । {সা সা -া ঋা I গা -া মা -া । -া -া [ম]পমা মা । -া -া -া মা । মগা মা পা -া I
না যে তাঁ • র উ • ছ • • • সি য়া • • • উ ঠু• ক স •

১´ ২ • ৩ ১´
I পা দা -া -া । দা মা দা -া । পা -া -া দা । দা দা র্সা না I র্সা র্সা -া -া ।
বা র • • • • হি • য়া • • দু খ শো • ক ক য় • •

২ • ৩ ১´ ২
। -া -া র্সনা র্সা । [ন]দা -া পা পা । দা [প]ণদা দা পা I [প]দা -া -া পা । ণা -া দপা দপা ।
• • হো• • ক • • দূ র হো ক • ভ • • • • • য়• ••

• ৩ ১´ ২
। ([ম]পমা গঋা সা সা)} । [ম]পমা গা -া দা । {দা দা র্সা না I র্সা র্সা -া -া । -া -া র্সনা র্সা ।
• • •• • না • • • • • ক রি তাঁ • র না ম • • • • গা• •

• ৩ ১´ ২ •
। র্সা -া -া দা । দা না র্সা র্সা I র্সা র্ঋা -া -া । -া -া র্সনা র্সা । ([ন]দা -া -া দা)} ।
ন • • পূ র্ণ হো • ক স র্ব • • • • কা• • ম • • ক

• ৩ ১´ ২ •
। [ন]দা -া -া দা । দা দা র্সা না I র্সা -া -া -া । -া -া র্সনা র্সা । [ন]দা -া পা পা ।
ম • • তাঁ হা র • চ র • • • • প্ থ• • রি • • হ

৩ ১´ ২ •
। দা [প]ণদা দা পা I দা -া -া পা । ণা -া দপা দপা । [ম]পমা গা মগা মা IIII
ও রে নি • র্ভ • • • • • য়• •• •• • •• "অ"

আশা—ঠুংরী।

তোমা সম প্রেমময় কে আছে শুভদায়ী
আজি নব নব ভাবে ভাই বন্ধু মিলে সবে সবে বন্দনা গীত তব গাই।
আনন্দ সঙ্গীত হইয়া ধ্বনিত গগন প্রাঙ্গন ছায়্
তারি সাথে একতানে গাহিব রে শত গানে প্রাণ মন হেন সদা চায়্।
হৃদয়ে হৃদয়ে আছে নাম তব উঠে বাজি সুখ বায়ু বহে সব ঠায়্
শান্তি সাগর তুমি আনন্দ আকর তুমি মন সদা তোমা পানে ধায়্।
তোমারে না পাই যদি আর নাহি কোন গতি মুক্তির নাহিক উপায়
তোমারি চরণ দাও লইনু শরণ তায়্ রেখো প্রভু রেখো তব পায়্।
আশীষ দাও শিরে ঘরে যেন যাই ফিরে তোমারি হেরি মুখ ভায়্
সংসার মাঝে ছোট বড় কাজে মোদের হইও সহায়।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ৩ ২ ৩
II সা সা। মা মা। মা মা। মপা মা I জ্ঞাঃ রঃ। জ্ঞা মা। জ্ঞঋা ঋা। সা -া} I
তো মা স ম প্রে ম ম • য় কে • শু ভ দা • • য়ী

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ৩
[মপা]
I মা মা। মগা মা। পা পা। পা পা I দা পা। দা ণা। দা দা। (পা দপা)} I পা পা I
আ জি ন • ব ন ব ভা বে ভা ই ব ন্ধু মি লে স বে• স বে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সদা -া। দা দা। পা দা। পা মা I মপা দপা। মপা মজ্ঞজ্ঞা। -া -া। ঋসা -া II
ব • ন্দ না গী ত ত ব গা • • • • • • • • • • • ই

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{মা -া। মগা মা। পা -া। পা পা I দা পা। দা ণা। দণদা -া। পা পা I
(১) আ • ন • ন্দ স • ঙ্গী ত হ • ই য়া ধ্ব • • • নি ত
(২) হৃ • দ য়ে• হৃ • দ য়ে আ ছে না ম ত ব উ • • ঠে বা জি
(৩) তো মা রে• না পা • ই য দি আ র না হি কো • • ন গ তি
(৪) আ • শী• ষ দা ও শি রে ঘ রে যে ন যা • • ই ফি রে

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দা -া। দা দা। পা দা। পা মা I মপা দপা। মপা -া। -া -া। -া -া} I
(১) গ • গ ন প্রা • ঙ্গ ন ছা • • • • • • • • • • য়্
(২) সু খ বা য়ু ব হে স ব ঠা • • • • • • • • • • য়্
(৩) মু • ক্তি র না হি ক উ পা • • • • • • • • • • য়্
(৪) তো • মা রি হে রি মু খ ভা • • • • • • • • • • য়্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I{মগা গা। গা গা। মা মা। মা মা I সা দা। দা দা। পা দা। পা পা} I
(১) তা রি সা থে এ ক তা নে গা হি বা রে শ ত গা নে
(২) শা • ন্তি সা গ র তু মি আ ন ন্দ আ ক র তু মি
(৩) তো মা রি চ র ণ দা ও ল ই নু শ র ণ তা য়্
(৪) সং • সা রে মা • ঝে • ছো ট ব ড় কা • জে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা দা। দা দা। পা দা। পা মা I মপা দপা। মপা মজ্ঞজ্ঞা। -া -া। ঋসা -া IIII
(১) প্রা ণ ম ন স দা হে ন চা • • • • • • • • • • য়্
(২) ম ন স দা তো মা পা নে ধা • • • • • • • • • • য়্
(৩) রে খো প্র ভু রে খো ত ব পা • • • • • • • • • • য়্
(৪) মো দে র হ ই ও স • হা • • • • • • • • • • য়্

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে হিন্দুধর্ম্ম।

(শ্রীসুকুমার হালদার)

১৮৬১।৬২ খৃষ্টাব্দে আমার পিতা লণ্ডনের University Collegeএ আইন (Jurisprudence) শিক্ষা করিতেছিলেন। সে সময়ে ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ অল্প কয়েকজন ব্যতীত বাঙ্গালী কম লোকই বিলাত গিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহনপ্রচারিত সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে তিনি যত্নবান্ হইয়াছিলেন। লণ্ডনে তিনি রাজা রামমোহনের বন্ধু William Adamএর সংস্পর্শে আসেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে Mr. Adamএর ভ্রাতুষ্পুত্রী Miss Helen Adam ২০শে মে ১৯০৩ সালে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺নির্ম্মলচন্দ্র হালদারকে যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করা গেল :—

"My acquaintance with your father began in this way. My uncle, Mr. Adam, lived for more than 20 years in Calcutta and its neighbourhood and he knew Hodgson Pratt during part of that time. He came to London to live and as he was not in good health I left my home in Scarbro' to come to him to help to nurse him. One day Mr. Pratt called to consult with uncle about a lodging for your father who had come to England with Mr. Dall, Baptist (wrong,—Unitarian) Missionary, and in some way they did not agree; so your father decided to act independently of him and consulted Mr. Pratt who at once thought of Mr. Adam as suitable to advise with, so the result was that your father came to board with uncle and myself, Mr. Pratt finding the necessary money which, as you know, your father repaid. During your father's stay with us he and I were very friendly and he used to talk to me about his home and his father. He went to Notting Hill to give lessons to some one there in Bengali and often returned very tired. He suffered in the cold weather from chilblains and I did all I could do to relieve him. Hence his grateful and brotherly attachment to me. After living with us some time your father became an inmate of University College, Gower St., and we did not see him often after that."

Sir William Bentinckএর আমলে, Mr. William Adam, Commissioner of Vernacular Education in Bengal, Behar and Orissa ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত হইয়া স্বসঞ্চিত বাংলা-পুস্তকসমূহ University College, লণ্ডনের পুস্তকাগারে প্রদান করেন। আমার পিতা ঐ পুস্তকগুলির ভিতর হইতে রামমোহন রায় রচিত হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক এক বাংলা পুস্তিকার ইংরাজী অনুবাদ *Cornhill Magazine*এ প্রকাশ করেন। অনুবাদটী নিম্নে দেওয়া গেল :—

RAMMOHUN ROY ON RELIGIOUS WORSHIP.

Sir,—The following translation of a small Bengali tract on Religious Worship, written by Rajah Rammohun Roy, is offered to your readers. The original (printed in 1829) is with the books presented by William Adam, Esq., to the library of University College, London. It contains nothing new or profound, nor is it characterized by the author's usual vigour of reasoning; but its chief merit consists in this—it shews clearly for what form of Religion the Rajah was preparing the minds of his countrymen.

With regard to the translation, it may be mentioned that no verbal rendering has been attempted. I have, besides, omitted the authorities from the Sastras, which Rammohun Roy had quoted in support of his statements.

Faithfully yours,
Rakhal Das Haldar.

University Hall, Gordon Square,
January 18, 1862.

Question. What is worship?

Answer. The attempt to gratify another is called worship; but with regard to the Supreme Being, it is the exercise of our intelligence respecting Him.

Q. Who is the Object of worship?

A. The Creator and Preserver of the universe, which is full of infinite varieties of things and persons, so incomprehensibly arranged, and so well adapted to each other, that nothing whatever is unnecessary; and which consists of the sun, the moon, the planets, and the stars, moving in their appointed paths far more wonderfully then clock-work.

Q. What sort of person is He ?

A. I have told you before that the Object of our worship is the Creator and Preserver of the universe. Neither scripture nor reason is able to affirm anything more about Him.

Q. Is there any means of ascertaining His nature ?

A. Both the Vedas and the Law repeatedly say that His nature trancends our comprehension and description, an affirmation which reason confirms ; for if the nature and extent of the universe, which is within our perception, cannot be known, how can the nature of God be known who is only inferred as the Creator and Preserver of the world ?

Q. Can any one object to this mode of worship ?

A. None can do so consistently, because we worship only the Creator and Preserver of the universe ; and to such a worship there can be no objection. Different sets of worshippers have different gods, but each set worship their peculiar god as the Creator and Preserver of the universe ; and, according to their own belief, they must acknowledge our worship as the worship of their peculiar gods. In this way, those who call time, or nature, or buddha (intelligence), or any object whatever, the Providence of the world, cannot reasonably object of the worship of Providence, simply as such. The various religious worshippers in China, Thibet, Europe and other countries, acknowledge their respective objects of worship as the Creator and Preserver of the universe ; and, according to their own belief, they must acknowledge our worship as the worship of their respective gods.

Q. In some passages of the Vedas, God has been termed imperceptible and incomprehensible ; and in others, cognisable ; how do you reconcile these contradictions ?

A. Where God is said to be imperceptible and incomprehensible, His nature is alluded to ; i. e., His nature cannot be known by any means. And where He is said to be cognisable, His existence is implied ; i. e., the admirable arrangements and laws observable in the universe imply that God exists. The functions of the body argue the existence of the intelligent soul in it ; but the nature of that soul which pervades the whole body and which guides it, i. e., what sort of thing it is, can by no means be known.

Q. Are you opposed and inimical to other worshippers ?

A. Never, whatever object men may worship, they worship, it, as God, or at least as the manifestation of God ; consequently, why should we be opposed and inimical to them.

Q. If you worship the same God as well as they, wherein do you differ from them ?

A. The difference between them and us is of two kinds. First, they ascribe to Him peculiar forms, and acknowledge certain localities as the places where He exists ; whereas we worship the intelligent Cause of the creation, without attributing to the same Cause any form or any particular location. Secondly, we find that the diffrent sets of worshippers of the particular forms of God quarrel with us, as has been said in answer to the fifth question.

Q. How is this worship performed ?

A. To contemplate, according to scripture and reason, that the Creator and Preserver of this perceptible universe is God, is the worship of Him. Self-control and the study of the Vedas &c., are the duties of the worshipper. By self-control, is meant an attempt to apply our mind and the organs of sense and action in such a way as will produce good to ourselves and others, instead of evil ; in fact, the worshipper is required to do to others only what he wishes they should do to him. By the study of the Vedas, is meant that the worshipper should contemplate God by employing words which imply His existence and attributes, as laid down in the Scriptures, since by habit we cannot comprehend meaning without words. Such words also should be used which signify that the benefits we are constantly receiving from fire, wind, the sun, the vegetable world &c, are derived from God ; and such sentiments should be confirmed by the exercise of reason. The Vedas repeatedly say that

truth is the basis of divine knowledge; so truth is to be depended upon, and thereby the worship of God, who is truth, is performed.

Q. According to this mode of worship, what are the rules regarding eating and the ordinary usages of life?

A. Eating and the ordinary usages of life should be regulated by the Scriptures. If any person does whatever he likes, without adopting any one of the recognized Sastras, he may be called a man of impulse. The Scriptures repeatedly forbid one to follow one's own inclinations only. Reason also says that if every one were to follow his own inclinations, and not the authority of the Scriptures, society would soon come to an end. To the followers of inclination, there is no distinction between propriety and impropriety of conduct; their conduct is justified by their inclinations. Now, the inclinations of all men are not of the same kinds; and in the fulfilment of various contrary inclinations disputes must frequently arise, and such frequent disputes may soon destroy society. The truth is, it is unworthy of man to spend his time in judging between the purity and impurity of food, instead of cultivating sciences and the knowledge of God. Whatever we may eat, it is changed within an hour and a half to what is called impure; this again is changed into articles of food, each as again, &c.: so the wise endeavour to purify their minds rather than their bodies.

Q. According to this mode of worship, are there any rules with regard to place, direction and time for worship?

A. Good time and place are desireable, but there is no special rule. Wherever, in whatever direction, or at whatever time, the mind is fixed, worship may be offered to God.

Q. Who is worthy to be instructed in this mode of worship?

A. All men are fit to receive instruction in this mode of worship; but our supreme felicity depends upon the degree of faith derived from purity of heart.*

* ইহা বাঙ্গলা "অনুষ্ঠান পত্রে"র অনুবাদ এবং ইহার রাজা রামমোহন রায়-কৃত ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন উৎসাহী সভ্য ৺রাখালদাস হালদার মহাশয়ের পৃথকভাবে কৃত এই অনুবাদটী বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রে সে সময় সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। তঃ সং

সুরাপানের নিষেধবিধি।

[PROHIBITION.]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। নিষেধবিধির অর্থ কি?

নিষেধবিধি বলিতে ভালমন্দ সকল বিষয়েরই, অন্তত মন্দ যে-কোন বিষয়েরই নিষেধবিধি বুঝাইতে পারে। কাজেই এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোন্ বিষয়ের নিষেধবিধি আলোচিত হইতেছে। তাই সর্ব্বপ্রথমেই আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে "নিষেধবিধি"র অর্থে সুরাপানের বিরুদ্ধে নিষেধ-বিধিই বুঝিতে হইবে। অহিফেনের মত সুরাপান-নিবারণসমস্যা সমগ্র জগতে বর্ত্তমানে পয়লা নম্বরের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্যাটী এতই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, "নিষেধবিধি" বলিতে এখন সর্ব্বত্র সুরাপানেরই বিরুদ্ধে নিষেধবিধি বুঝায়; "prohibition বলিতে এখন prohibition against wine drinkingই বুঝায়। আমরাও সুরাপানের বিরুদ্ধে নিষেধ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া জনসাধারণের মতানুসারেই সংক্ষেপে "নিষেধবিধি" শব্দই সাধারণত ব্যবহার করিব।

২। ভারত ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ড।

সুরাপানের ফল যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে না গিয়া কিরূপে পোষকতা করেন বা নীরব থাকিতেও পারেন, আমরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। ভারতবর্ষ চিরকালই মদ্যপানের বিরোধী এবং বহুকাল যাবৎ ভারতবর্ষই এবিষয়ে সমগ্র জগতকে আদর্শ দেখাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজকাল অন্যান্য নানা বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও আদর্শের জন্য, অনুশাসনের জন্য ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য জগতের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হইতেছে। যাই হউক, পাশ্চাত্যদের বিশেষত যুক্তরাজ্যের নিকট হইতেও অনুশাসনবাণী গ্রহণ করিয়া যদি ভারতবাসী এদেশে নিষেধবিধি ফিরাইয়া আনিতে পারেন, দেশ হইতে সুরাপানকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তবে খুবই মঙ্গল।

৩। নিষেধবিধির পথে বাধা।

নিষেধবিধি এদেশে ফিরাইয়া আনিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে সর্ব্বপ্রধান বাধা হইল আমাদের পরাধীনতা। যদি ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন থাকিত, তবে যেদিন দেশবাসী উপলব্ধি করিত যে, সুরাপানের ফলে দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, সেই দিনই তাহারা

একটা আইন করিয়া দেশে নিষেধবিধি প্রবর্ত্তন করিতে পারিত এবং দেশও সুরারাক্ষসীর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারিত। কিন্তু আমরা স্বাধীন নহি। এই সত্যটীকে ধরিয়া লইয়া এবিষয়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সত্যকে দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া এবিষয় আলোচনা করিতে থাকিলে বা এতদ্বিষয়ক কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহিলে বিশেষ কোনই লাভ হইবে না। আমরা স্বাধীন নহি, আমরা বহু-শতাব্দীর পরাধীন জাতি, এবং বর্ত্তমানে আমাদের পদযুগল সেই পরাধীনতার শৃঙ্খলকে দ্বিগুণ চৌগুণ ভারী করিয়া তাহা দ্বারাই বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা অন্তরে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া, ইহা স্পষ্টাক্ষরে মানিয়া লইয়া দেখিতে হইবে যে, সুরারাক্ষসীর বিরুদ্ধে কি ভাবে সংগ্রাম করিলে আমরা জয়লাভ করিতে পারি। কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভারতবাসী মাত্রেরই ধর্ম্মশাস্ত্র সুরাপানের এরূপ বিরোধী যে, বোধ হয় এ বিষয়ে কাহারও দুই মত হইতে পারে না যে, আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, তবে কাল সুরা-রাক্ষসী লুকাইবার স্থানটুকু পাইবে কি না সন্দেহ।

৪। বর্ত্তমান আইনসভা ও নিষেধবিধি।

বর্ত্তমান ভারতের আইনসভাগুলি যেভাবে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে আইনের দ্বারা এদেশে নিষেধ-বিধি জারি করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ধরিয়া লইলাম যে, সর্ব্ববাদসম্মত হইবার বর্ত্তমানে কোনই সম্ভাবনা না থাকিলেও, অধিকাংশ সদস্যদিগের মতে সিদ্ধান্ত হইল যে নিষেধবিধি জারি করা হউক। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত বড়লাটের অনুমোদনলাভ না করিলে আইনে পরিণত হইতে পারিবে না, অর্থাৎ জারি করিবার ঔচিত্যসমর্থক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া থাকিবে। বড়লাট দেশবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হন নাই; তিনি বিলাত হইতে সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া এদেশকে শাসনে রাখিবার জন্য আসিয়াছেন। অর্থ হউক, সম্মান হউক বা অন্য যাহা কিছু হউক, একটা কোন স্বার্থের জন্য, হয় নিজের চেষ্টায় অথবা বিলাতের মন্ত্রীসভার অনুরোধে তিনি মূলত ইংলণ্ডরাজ, কিন্তু প্রসঙ্গত ভারতসম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা স্বাধীন নহি, এই সত্যের সঙ্গে এই দ্বিতীয় সত্যটীও আমাদের স্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, বড়লাট এদেশবাসীর নিযুক্ত নন, তিনি বস্তুত ইংলণ্ড-বাসীর নিযুক্ত কর্ম্মচারী। বড়লাট নিজেও এই সত্য খুব ভালরূপই জানেন। কাজেই তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ও প্রধানতম লক্ষ্য থাকিবে, যাহাতে তাঁহার শাসনকালে ভারতশাসনের ভিতর দিয়া তিনি নিজের দেশবাসীর কল্যাণসাধন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতে পারেন। এদেশের কল্যাণ তাঁহার অন্তরে স্বভাবতই স্বদেশের কল্যাণসাধনের পর স্থানপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কাহাকেও ঘৃণা করিবারও কিছু নাই, কারণ ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের পাপের দণ্ডস্বরূপেই হউক, অথবা আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই হউক, আমরা এখন বিজিত এবং ইংরাজ-জাতি জেতা। সুতরাং জেতা ও বিজিতের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই কতকটা যে খদ্যখাদকের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ থাকিবেই, তাহা বলা বাহুল্য। তবে, যদি জেতা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া বিজিতের প্রতি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া হৃদয়ের সমস্ত ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিব।

৫। বড়লাট স্বদেশবাসীর কলকাঠিমাত্র।

বলা বাহুল্য, বড়লাট তাঁহার স্বদেশবাসীর সন্তোষ-সাধন করিতে পারিলে নির্দ্দিষ্ট শাসনকালের পর তাঁহার পদোন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এদেশের মঙ্গল-সাধন করিতে গিয়া যদি কোন বড়লাট এমন কোন ব্যবস্থা করিয়া বসেন, যাহাতে বিলাতের তিলার্দ্ধ অনিষ্ট সাধিত হয়; বিলাতবাসীর পকেটে বর্ত্তমানে যত টাকা গিয়া পৌঁছিতেছে, সেই টাকার বেশী পাইবার পরিবর্ত্তে বিলাতবাসীরা কিছু কম পাইল, তাহা হইলে বিলাতে এতই হৈ-চৈ উঠিবে যে, সে বড়লাট আর এখানে থাকিতে পারেন না; 'উহাকে ফিরাইয়া আন' 'এ বড়-লাট বড়ই অকর্ম্মণ্য', এই ভাবের এমন কোলাহল-কলরব উঠিবে যে, মন্ত্রীদের পক্ষে "কাণপাতা" অসম্ভব হইবে—তাঁহারা যতক্ষণ না সেই বড়লাটকে ফিরাইয়া আনেন, ততক্ষণ তাঁহাদের অদৃষ্টে শান্তির কোনই আশা থাকে না। কাজেই তাঁহারাও তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হন, তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে বিনা কাল-বিলম্বে কেবলমাত্র কর্ত্তব্য করিবার শান্তি অন্তরে ধারণ করিয়া ভালমানুষের মত স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন—তাহার প্রতিবাদে সম্রাটেরও সাহসে কুলায় না।

৬। মদ হইতে আয়।

সুতরাং ভারতের প্রকৃত মঙ্গলসাধনে যদি বা কোন বড়লাটের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকে, তথাপি কোনও বড়লাটই সে ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে কিছুতেই সক্ষম হন না। কাজেই নিষেধবিধি জারি করিবার সিদ্ধান্ত আইনসভায় গৃহীত হইলেও উহাতে বড়লাটের মঞ্জুরি পাইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। কারণ নিষেধবিধি জারি হইবার ফলে, এক তো উহা হইতে গবর্ণমেণ্টের আবগারি বিভাগের যে আয় হইত, সেই;

আয় বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা ; দ্বিতীয়, মদ্যপান এদেশে সজীব থাকিবার ফলে দেশী মদের সঙ্গে বিলাত হইতে আমদানী মদের যে কাটতি হয়, এবং তাহার ফলে বিলাতের ধনী ও শ্রমিক উভয়েরই পকেটে যে অর্থের সমাগম হয়, নিষেধবিধির আইন জারি হইলে বিলাতের লোকদের সেই আয়ের অনেকটাই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আসে। আবগারি বিভাগের আয়ও বড় অল্প নহে—ন্যূনাধিক বিশ কোটী টাকা শুধু মদ্যের কারবারে উঠে। * এই প্রকারে আয়ের হ্রাস হইলেই বিলাতের মদ্যবণিকেরা এবং তাঁহাদের সঙ্গে তথাকার শ্রমিকসংঘও একই স্বরে এতই আন্দোলন ও চীৎকার করিতে থাকিবেন যে, তাহার তরঙ্গের উপরে উঠিয়া ভারতের প্রতি নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার করা কোনও বড়লাটেরই ক্ষমতায় কুলাইবে না। সুতরাং প্রথম হইতেই আমাদের জানিয়া রাখা ভাল যে, ইহা ষোল আনার উপর সুনিশ্চিত যে, আইনসভায় যতই কেন সিদ্ধান্ত হোক না, কোনও বড়লাটই সম্ভবপর হইলে কখনই নিষেধবিধিকে আইনে পরিণত হইতে দিবেন না।

৭। আইনসভা প্রভৃতির অক্ষমতার দৃষ্টান্ত।

সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে সাধারণত নিষেধবিধির স্বপক্ষে একটা প্রস্তাব এবং তদনুকূলে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের উপর স্থানীয় লোকদিগের ইচ্ছানুযায়ী নিষেধবিধি জারি করিবার অনুরোধমূলক একটী প্রস্তাব দিল্লীর আইনসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং ৩২ বনাম ৬০ ভোটে গৃহীতও হইয়াছিল। এই ৩২ ভোটের অধিকাংশ ছিল ইংরাজ-সদস্যের এবং সরকারী কর্ম্মচারীর। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশের মত ঐ প্রস্তাবের অনুকূলই ছিল। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া জানি না। স্বরক্ষ সার বেসিল ব্ল্যাকেট এই প্রস্তাবসম্বন্ধীয় আলোচনার সময়ে গবর্ণমেণ্টের তরফে বলিয়াছিলেন যে, "যদি কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট local option বা স্থানীয় লোকদিগের ইচ্ছানুরূপ সংকীর্ণ নিষেধবিধি বা পূর্ণ নিষেধবিধির (absolute prohibition) প্রস্তাব আইনে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন, তবে ভারত গবর্ণমেন্ট হাত-পা গুটাইয়া তাহা নিশ্চলভাবে দেখিতে পারিবেন না," এক কথায়, ভারত গবর্ণমেন্ট তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। বঙ্গের আইনসভায় "স্থানীয় অভিপ্রায়" বা local option অনুসারে সংকীর্ণ নিষেধবিধির প্রস্তাব গৃহীত হইলেও বঙ্গের লাট তাহা না-মঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন। বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতা কর্পোরেশন একবার স্থির করিলেন যে, মদের আড্ডা বা saloonগুলি সমস্তই সহরের সীমার বাহিরে বহিষ্কৃত করা হোক। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন না। এই সেদিন মান্দ্রাজের আইনসভাও পূর্ণ নিষেধবিধির প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া স্থির করিলেন যে, সেই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য মদের দোকানগুলি প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তও কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।*

৮। "স্থানীয় অভিপ্রায়ের" মূল্য আছে।

পূর্ণ নিষেধবিধির না হোক, অন্ততঃ "স্থানীয় অভিপ্রায়" বা local option অনুসারে সংকীর্ণ নিষেধবিধির যে বিশেষ মূল্য আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। অভাবগ্রস্ত সাধু লোকের সম্মুখে ক্রমাগত ধনরত্ন রাখিয়া প্রলোভন দেখাইলে সাধুও অনেক সময়ে অসাধু প্রস্তুত হয় ; এবং অসাধুরও সম্মুখ হইতে প্রলোভনের বিষয়সকল দূরে সরাইয়া রাখিলে অসাধুরও সাধু প্রস্তুত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। এ বিষয়ে অনেকেরই হয় তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এদেশে কলকারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে মদের দোকান অবাধে খুলিতে দেওয়া হয় বলিয়াই দেখা যায় যে, তথাকার অধিবাসী শ্রমিকেরা প্রায়ই মাতাল ও দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে ; এমন কি, সেখানে ভদ্রলোকদিগের বাস করা কঠিন হয়। বাল্যকালে আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়ি, তখন বর্ত্তমান কলেজ মার্কেটের স্থানে মদের ও তদানুষঙ্গিক দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের একটা আড্ডা ছিল। সুবিধা থাকিবার কারণেই অনেক ছাত্র সেখানে যাইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিত। একবার এক ভদ্র পণ্ডিতপরিবারের বালক ছাত্র কর্ত্তৃক ঐ স্থানে একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তখন ঐ প্রকার আড্ডা বিদ্যালয়ের নিকটে থাকার কুফল বিবেচক ব্যক্তিগণের চক্ষে আসিয়া ধরা দিল। তখন উহার বিরুদ্ধে তদানীন্তন সমস্ত সংবাদপত্রে ও সকল সভাসমিতিতে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করা হইল। সেই আন্দোলনের ফলে বিদ্যালয়ের নিকট মদের দোকান প্রভৃতি থাকার কুফল গবর্ণমেণ্টেরও হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে সে স্থান হইতে গবর্ণমেণ্ট ঐ মদের দোকান ও বারাঙ্গনা-পল্লী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই অবধি ছাত্রদের মধ্যে কুপথে চলিবার প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম। এরূপ

* East Bengal Times—August 31, 1929.

* East Bengal Times—31 Aug, 1929.

শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের নিত্যই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতেই স্থানীয় অভিপ্রায়ের গুরুত্ব এবং কলিকাতা কর্পোরেষণ, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতির এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহের সার্থকতা সহজেই উপলব্ধ হইবে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই এক সময়ে কলিকাতার চেয়ারম্যান বা পুলিশ কমিশনর কলিঙ্গা প্রভৃতি পল্লীতে অবস্থিত মদের ও দুশ্চরিত্র বিদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আড্ডা কড়েয়াতে সরাইয়া দিয়াছিলেন— সে সময়ে বালিগঞ্জের কড়েয়া একটা নগণ্য পল্লীমাত্র ছিল।

৯। শৌণ্ডিকালয়ের পরিপার্শ্বে নৈতিক অবনতি।

ইহা দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামের যে সকল অংশে মদের দোকান খোলা হইয়াছে, সেই সকল অংশেরই চতুঃপার্শ্বের অধিবাসী অশিক্ষিত লোকেরাই মদ্যপানরত হয়; এবং সহরের জঘন্য পল্লী(slum)সমূহের বাসিন্দারাও অনেকেই সুরাপানে অভ্যস্ত হয়। সুখের বিষয়, সমাজশাসনের ফলে এখন পর্য্যন্ত সুরাপানের ঢেউ পল্লীগ্রামের অন্তরে গভীর-রূপে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু বড়ই পরি-তাপের বিষয় যে, সহরপ্রবাসী পল্লীবাসীদের কল্যাণে ঐ শাসনের মর্য্যাদা ক্রমশই উল্লঙ্ঘিত হইতে চলিয়াছে। বিশেষত যে সকল পল্লীগ্রামে কলকারখানা উঠিয়াছে, তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের প্রাবল্য এবং তাহার অপরিহার্য্য সঙ্গী নৈতিক অবনতি প্রত্যক্ষ করিলে অশ্রু সম্বরণ দুরূহ হয়। যাঁহারা প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

১০। বাধার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট যে নিষেধবিধির বিরুদ্ধে, সুতরাং প্রকারান্তরে মদ্যপান-প্রসারের সপক্ষে দণ্ডায়মান, তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রত্যক্ষ কারণ হইল—ইহার ফলে আবগারি বিভাগের আয় সহসা হ্রাস পাইবার বা বিলুপ্ত হইবার বিভীষিকা। চিন্তাশীল অনেকেরই ধারণা এই যে, গবর্ণমেণ্টের এই বিভীষিকার বিশেষ সুদৃঢ় কোন ভিত্তি নাই। তাঁহারা বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট অনেক অর্থ তো অপব্যয় করেন; সাম্রাজ্যনীতির দোহাই দিয়া অনেক অনাবশ্যক কার্য্যে, অকারণ অনেক বড় বড় প্রাসাদনির্ম্মাণে এবং নানা নিষ্ফল দৃশ্যরচনায় গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ নষ্ট করেন, সে অর্থ ঐ প্রকারে নষ্ট না করিলে গবর্ণমেণ্টকে আবগারির আয় কমিবার বিভীষিকায় ভীত হইতে হইত না। "ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র তাঁহা-দের এই উক্তি সমর্থন করিয়া বলেন—"গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতির আশঙ্কাপ্রকাশ হাস্যজনক, যখন ঐ টাকার অনেকগুণ বেশী টাকা তাঁহারা এমন সমস্ত কার্য্যের পশ্চাতে ছড়াইয়া দেন, যাহা জনমতও সমর্থন করে না, আর নিষেধবিধির তুলনায় যাহার অন্তর্নিহিত কোনও মূল্যও নাই।"

১১। নিষেধবিধিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় কি না?

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অনেক সময়ে এই একটা আপত্তি উপস্থিত করা হয় যে, "নিষেধবিধি নীতিবিগর্হিত, কারণ ইহাতে প্রজাগণের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করা হয়"! একথা মানিয়া লইলে শুধু সমাজসংস্কার কেন, কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার সংস্কারকার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায় না। ভারতবাসী এ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম। সমাজ ধ্বংস হইবে, অথচ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়া দুর্নীতিকে বজায় রাখিতে হইবে, শুধু ভারতবাসী কেন, মানবমাত্রেরই নিকট এরূপ যুক্তির কোনও মূল্য নাই। এই যুক্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করিলে কাহারও কোনও দুষ্কার্য্যেই বাধা দেওয়া উচিত নহে। এই যুক্তি যদি স্বীকার করা যায়, তবে চোরের চৌর্য্যকার্য্য দূরে থাক, খুনীর নরহত্যা-কার্য্যও আইনের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করা সঙ্গত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট এই সকল কার্য্যে যখন সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিতে বিরত হন না, যখন criminal code, penal code প্রভৃতি উঠাইয়া দিতে সম্মত নহেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের ওজরে নিষেধবিধির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো শুধু শূন্যগর্ভ ফাঁকা আওয়াজ নয়, কিন্তু নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপারও বটে।

১২। হেনরি ফোর্ড বলেন—হয় না।

এ সম্বন্ধে হেনরি ফোর্ডের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। আজকাল "Ford car"এর কল্যাণে হেনরি ফোর্ডের নাম জানেন না, শিক্ষিতসমাজে এমন ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তিনি অধিবাসী; সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অতিমাত্র পক্ষপাতী। তিনি নিজেরও ব্যক্তিগত স্বাধী-নতা পরিত্যাগে যেমন সম্মত নন, সেইরূপ যুক্তরাজ্যের অন্য কোনও অধিবাসীরও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাহরণেরও পক্ষপাতী নন। তাঁহার কারখানায় লক্ষাধিক শ্রমিক খাটিয়া অন্নসংস্থান করে। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় কারখানা নাকি দ্বিতীয় নাই। এত অধিক শ্রমিক-দিগকে যিনি পরিচালিত করেন, এবিষয়ে তিনি যাহা বলেন, তাহা নিশ্চয়ই অবহেলার যোগ্য নহে। তিনি বলেন—"সুরাসক্তি হইতে জাতির মুক্তিলাভের ফলে

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, নিষেধবিধিকে অধিকারে হস্তক্ষেপ বলা শিশুর প্রলাপোক্তি মাত্র। ধরিয়া লওয়া যাক যে, একজন লোকের মদ খাইয়া আত্মহত্যা করিবার ব্যক্তিগত অধিকার আছে; কিন্তু তাহাকে সেই সুরা সরবরাহ করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার সমাজের নাই; সমাজের ইহা বলিবার অধিকার নাই যে, যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেন্টকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ লোকটীর মদ খাওয়া দরকার; সমাজের এই হুকুম জারি করিবার অধিকার নাই যে, লোকটীর সঙ্গে মার্কিন স্ত্রী ও মার্কিন শিশুদের শতকরা এতজন স্বতই ধ্বংসমুখে প্রবেশ করিবে।"*

১৩। নিষেধবিধি ও অবৈধ উপায়ে মদ্য-
সংগ্রহের সম্ভাবনা।

আরও একটী কথা সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হয়, এবং সে কথা ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে খুবই জোরের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করা হয় যে, "নিষেধবিধি জারি করিলে লোকে প্রত্যক্ষভাবে মদ্যসংগ্রহে সক্ষম না হইয়া অবৈধ উপায়ে smuggle করিয়া মদ্যসংগ্রহ করিবে; তাহার ফলে মদ্যপান নিশ্চয়ই অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে"। ইহা নিতান্তই বাজে কথা—আলোচনারই অযোগ্য বাতুলোক্তি মাত্র। সুরাপানের প্রতিবিধানকল্পে নিষেধবিধি জারি করিতে অগ্রসর হইলেই যদি সুরাপান-বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা হয়, তবে চুরি করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নরহত্যা করিবে না, এই সমস্ত নীতিগর্ভ উপদেশবাক্য আইনকানুনে বিঘোষিত করা হয় কেন? তখন তো বিচারে এ যুক্তি মোটেই স্থান পায় না যে, ঐ সকল উপদেশ প্রচার করিবার ফলে উহাদের বিরোধী দুর্নীতি-সকল বৃদ্ধি পাইবে? কার্য্যক্ষেত্রেও তো দেখা যায় যে, ঐ প্রকার আইনকানুনের ফলে ঐ সকল দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবার পরিবর্ত্তে হ্রাসপ্রাপ্তই হইয়াছে। নচেৎ আইনকানুনের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না।

১৪। ভূতের মুখে রামনাম।

ইংরাজপরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে যখন দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ঘোষণা করা হয় যে, নিষেধবিধি জারি করিবার ফলে রুষিয়াতে এবং মার্কিনরাজ্যে মাতলামি বাড়িয়া গিয়াছে, দুর্নীতি বাড়িয়া গিয়াছে, তখন ভারতবাসী আমরা সে কথা কেবল যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি তাহা নহে, সে কথা শুনিয়া আমরা হাসিয়া মরি! জানি না, সে সংবাদ ঐ সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক মহোদয়গণ রাখেন কিনা। আমরা তাঁহাদিগকে এই খাঁটি সত্য সংবাদ উপহার দিতে পারি যে, ভারতের শিক্ষিত-সম্প্রদায় শুঁড়ির মুখে মদের প্রশংসার মত ঐ সকল স্বার্থান্ধ সম্পাদকগণের মুখে নিষেধবিধির কুফল বর্ণিত হইতে শুনিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া অবিশ্বাসেরই হাসি হাসেন—তাঁহাদের কথা তিলমাত্র বিশ্বাস করেন না। ইহা বলা বাহুল্য, ঘরে বসিয়া নিষেধবিধির কুফল যাঁহারা দেখেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যে দেশে নিষেধবিধি জারি হইয়াছে, সেই দেশের অধিবাসী অথবা সেই দেশে গিয়া যে সকল পর্য্যটক এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। রুষিয়াতে যে সময়ে vodka মদ্যের নিষেধবিধি জারি হইয়াছিল, তথাকার অধিবাসী এবং ইংরাজ রুষিয়াপর্য্যটকদিগের রুষিয়াসম্বন্ধীয় বিবরণে দেখিয়াছিলাম যে, উক্ত নিষেধবিধির ফলে মাতলামি-সম্ভূত মকদ্দমারাশি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে বলিলেও চলে, এবং প্রত্যেক রুষবাসী শ্রমিক নাকি ব্যাঙ্কেও অল্প-বিস্তর টাকা সঞ্চিত রাখিতে সক্ষম হইতেছে। সেই প্রকার মার্কিনরাজ্যে নিষেধবিধি জারি করিবার অগ্রণী ঐ রাজ্যে উহার ফলাফল যাহা বলিবেন, শত ইংরাজ সংবাদপত্রসম্পাদক স্বার্থান্ধ হইয়া যাহা প্রচার করিবেন, তদপেক্ষা সহস্রগুণে বিশ্বাসযোগ্য নিঃসন্দেহ। তিনি মার্কিনরাজ্যে নিষেধবিধি জারির ফল যাহা হাতে-কলমে facts and figures দ্বারা দেখাইয়াছেন, নিষেধবিরোধী পক্ষ যতই কেন মিথ্যা রটনা করুন না, সেই সকল facts and figures হইতে প্রত্যেক নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন যে, নিষেধবিধি জারির ফলে মার্কিন রাজ্যে প্রভূত উপকারই সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইংরাজ সম্পাদকেরা অনেক সময়েই নিষেধবিধির কুফল জোর করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সময়ে সময়ে ভূতের মুখে রামনামের মত সত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে। যে সকল কাগজ নিষেধবিধি জারির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মত গড়িয়া তুলিবার জন্য আড়েহাতে

---

* Personal liberty is so much increased by the nation's emancipation from alcoholic addiction that it is childish wilfulness to talk about infringement of rights. Let us say that a man has a personal right to drink himself to death; we, as society, have no right to go into the business of serving him drink; we have no right to say that his drinking is necessary to the support of the United States Government; we have no right to decree that a certain persentage of American wives and American children shall automatically perish with him, Statesmen—13 10 29.

লাগিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদেরই অনেকে আজ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "ইহা সর্ব্ববাদসম্মত সত্য যে, সুরাপান রহিত হইলে অধিকাংশ লোকের মঙ্গল হয়।"*

১৫। নিষেধবিধির সমর্থনে হেনরি ফোর্ড।

এ বিষয়ে পুষ্পিফুট জনমনের দেশবাসী মার্কিনপ্রবর হেনরি ফোর্ড যাহা বলিয়াছেন, এবং যাঁহার উক্তির বিরুদ্ধ রাহ্বাস্ফোট সংকারে "যুদ্ধং দেহি"র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া এই সেদিন কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই হেনরি ফোর্ডের উক্তির কিছু কিছু অংশ আমাদের মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করিতেছি।

ফোর্ড বলেন,—"যুক্তরাজ্যে যদি মদ্যপানের ধুয়া ফিরিয়া আসে, তবে আমার কারখানার শেষ হইবে।" "মদের প্রচলন অব্যাহত থাকিতে আমি দুই লক্ষের উপর শ্রমিকদিগের পরিচালনায় স্বীকার করিতাম না। অথবা মাতাল generationএর হাতে মোটর গাড়ী দিবার জন্য আমার কোনই আকাঙ্ক্ষা হইত না।" "মদ বন্ধ হইলে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন (কম ঘণ্টায়) ভাল কাজ পাই; মদ চলিলে সপ্তাহে আসলে মোটে দুইতিন দিন কাজ পাই।" "শ্রমিক যদি সপ্তাহে দুই-তিন দিন (বোধ হয় শনি, রবি ও সোম) ধরিয়া মদ খায়, ১০।১২ ঘণ্টায় দিন ধরিয়া সপ্তাহে ছয় দিন, এমন কি সাত দিনও খোলা রাখিতে হয়। মদ না খাইলে, ৮ ঘণ্টায় দিনে সপ্তাহে ৫ দিন খাটিলেই চলে।" "কারখানা ভালরকম চালাইতে গেলে সুরাভ্যস্ত লোকদিগকে লইয়া চলিতে পারে না—কর্ত্তাই বল বা শ্রমিক বল, যে কেহ মদ খাইবে, তাহারই মস্তিষ্ক বিকৃত হইবে।" "মদ খাইলে লোকে নিখুঁতভাবে গণনা করিতে পারে না, আর তাহা না পারিলে আমি যে দুই লক্ষ মাইল চলিবার উপযুক্ত মোটর গাড়ী প্রস্তুত করিবার কল্পনা করিতেছি, তাহা প্রস্তুত করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না।" "মানুষ যখন নিজের কাজ ভাল করিয়া করিতে না পারে, তখন আর সে কাজে তাহার তেমন আগ্রহ থাকে না—শ্রমশিল্পের পক্ষে ইহাই বৃহত্তম বিপদ। নিজের জীবনে ও কার্য্যে প্রত্যেক মানুষের যে অনুরাগ থাকে, তাহারই ফলে জগতসংসার চলিতেছে; তাহারই ফলে কাজকর্ম্মকে সফল করিবার উপযুক্ত উৎসাহ প্রকাশ পায় ও সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বিষয় আবিষ্কার করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।" মার্কিনরাজ্যে "নিষেধবিধির মূলে স্ত্রীলোক, যাঁহারা গৃহে সুখশান্তি চাহিতেন। যদি গৃহে স্ত্রীলোকেরা নিষেধবিধির মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তবে অন্যান্য স্থানে যদি ঐ বিধি রক্ষিত না হয়, তবে তাহার জন্য আমাদের কিছুমাত্র চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই—সুরাপান স্বতই অন্তর্হিত হইবে।" একটী কথা তিনি বড়ই মনের দুঃখে বলিয়াছেন—"ধনীদিগের গৃহিণীরা (আমরা বলিব "ধনীরা") যদি জানিতেন যে, তাঁহারা শ্রমিকের স্ত্রীপুত্রদিগের সুখশান্তি সত্যই নষ্ট করিতে চলিয়াছেন, আমার স্থির বিশ্বাস যে, তাহা হইলে তাঁহারা সুরারাক্ষসীকে নিকটে আসিতে দিতেন না—শত হস্ত দূরে রাখিতেন।"

তিনি বলেন—(মার্কিন রাজ্যে) "শতকরা ৯৯ জন নিষেধবিধিকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছে। বাকী শতকরা ১ জন—ধনী, criminal ও abandoned class লইয়া সংগঠিত"। "মার্কিনদিগের উপর নিষেধবিধি জোর করিয়া চাপানো হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।" ফোর্ডের বিশ্বাস যে, আজকাল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ধনীসম্প্রদায়েরও মধ্যে সুরাপান অভদ্রোচিত বলিয়া গণ্য হইতে চলিয়াছে, কাজেই তাহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তিনি বলেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে যেখানে সেখানে ভালমন্দ সকল রকমেরই মদ পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে শতকরা ৫০।৬০ ভাল হইয়াছে। * * * সমাজের হাওয়া কোন্ দিকে চলিতেছে, ইহা তাহারই পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে প্রদান করিতেছে।" ফোর্ডের এই সকল উক্তির পরে ইংরাজ সম্পাদকমহোদয়গণের উক্তি বা গবর্ণমেণ্টের উক্তিসকল কি আর বিশ্বাস করা যায়?

১৬। মদ্যপান ও দারিদ্র্য।

মদ্যপানের ফলে যে সকল সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তন্মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম। মদ্যপান দারিদ্র্য আনে, আবার দারিদ্র্যের ফলে মদ্যপানে আসক্তি বৃদ্ধি পায়। মদ্যপান ও দারিদ্র্যের সম্বন্ধবিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন, সেই সকল বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন যে, শ্রমিকসম্প্রদায় তাহাদের আয়ের প্রায় একচতুর্থ অংশ সুরারাক্ষসীর চরণে সমর্পণ করে। All-India Trade Union Congress (নিখিলভারত-বাণিজ্যসম্মেলন কংগ্রেস) বলেন যে, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বম্বের কাপড়ের কলওয়ালারা শ্রমিকদিগকে যে বেতনবৃদ্ধি দিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই মদের দোকানের মালিকদিগের পকেটে গিয়া পড়িয়াছে। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আমি যখন হাবড়া মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি ছিলাম, তখন দেখিতাম যে, যে কয়েক দিন মেথর প্রভৃতির বেতন পাইবার দিন থাকিত, সেই কয়েক দিন জনকয়েক বাঙ্গালী ও কাবুলী মহাজন মোটা মোটা লাঠি হস্তে বেতন দিবার স্থানে হাজির।

* That most people are better without "booze" is by this time common ground.
Statesman—8. 10. 29.

ব্যাপার এই যে, শ্রমিকেরা ঐ সকল মহাজনদের নিকট সমস্ত মাস ধরিয়া "চোটা সুদে" (খুব বেশী, এমন কি, শতকরা ৭৫০ টাকা সুদে বা তাহারও বেশী সুদে) ধার করিয়া মদ খাইয়াছে; এখন তাহারা যাহা কিছু বেতনাদি পাইবে, দুইএক টাকা মাত্র নিজের হাতে রাখিয়া বাকী সমস্ত বেতন—যায় উপরি পাওনা ঐ সমস্ত মহাজনদের হাতে দিবে। কাজেই এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে তাহাদের হাত শূন্য হইয়া যায়। তখন বাকী তিন সপ্তাহ তাহারা আবার মহাজনদিগের নিকট ধার করিয়া ঘরসংসার চালায় আর মদ খায়। ইহার মধ্যে মজাটুকু এই যে, পয়সার অভাব যতই বাড়ে, সেই অভাবের বোধটুকু ভুলিয়া থাকিবার জন্য ততই তাহারা মদ্যপানে বিভোর ও অজ্ঞান হইয়া থাকিতে চায়। এই-রূপে মদ্যপানের ফলে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের ফলে সুরা-সক্তিবৃদ্ধি পাইতে থাকে—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে—argument in a circle।

১৭। গবর্ণমেন্টের আয়হ্রাসের বিভীষিকা অকারণ।

ইহার প্রতীকারকল্পে চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, এ রোগ কেবল বাহিরের রোগ নয় যে, শুধু উপর-উপর ঔষধ লাগাইয়া ইহার প্রতীকার করা সম্ভব হইবে; ইহার প্রতীকার করিতে গেলে মূলে গিয়া ধরিতে হইবে—মদের দোকানগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু সে ক্ষমতা তো গবর্ণমেন্টের হাতে। অনেক বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন যে, শ্রমিকদিগের মধ্যে যে বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন চলিতেছে, তাহার অনেক অংশই খুব স্বাভাবিক নহে—বেশীরভাগই মদের দোকানদার প্রভৃতি ধনীদিগের দ্বারা গড়িয়া তোলা বা engineered। বর্ত্তমানে চারিদিকে শ্রমিকদিগের ক্রমাগত বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনের জ্বালায় কি কলকারখানা, কি মিউনিসিপালিটি, আর কি গবর্ণমেন্ট, সকলেই অস্থির হইয়া উঠিতেছেন, তবু কেহই মূলে গিয়া পৌছিতে চান না। এ বিষয়ে বলা বাহুল্য, সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের, কিন্তু তাঁহারা মূলে যাইতে চান না—তাঁহাদের ঐ বিভীষিকা, পাছে একটা আয় কমিয়া যায়। কিন্তু মদে টাকা না উড়াইয়া প্রজারা যদি হাতে কিছু টাকা সঞ্চিত করিতে পারে, তবে মদের দোকান উঠাইয়া দিবার কারণে গবর্ণমেন্টের যে টাকা লোকসান হইবে, সে টাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাদের নিকট হইতে অনায়াসে পূরণ করা যাইতে পারে, ইহা দেশবাসী সকলেরই বিশ্বাস। আর ইহাও স্থির যে, এভাবে ক্ষতিপূরণের ফলে এখনকার মত অসন্তোষের বীজ দিকবিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।

১৮। ভূপালের বেগমের সাক্ষ্য।

নিষেধবিধি জারির সুফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমাদিগের দেশ-বিদেশে দূরদূরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নাই। হাতের গোড়ায়, ভূপালরাজ্যে নিষেধ-বিধি জারির কি সুফল ফলিয়াছে, ভূপালের বেগম তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই নিষেধ-বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি প্রজাদের মধ্যে ভালর দিকে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার ফলে স্ত্রীলোকেরাই বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। ইহা প্রবর্ত্তিত করিতে ও ইহাকে সফল করিতে বিশেষ কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। মুসলমান-ধর্ম্ম সুরাপানের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং নিষেধ-বিধিপ্রবর্ত্তনে উহারই অনুমোদিত পন্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে হিন্দুরাও কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। ইহার ফলে প্রজাদের সুখ ও মঙ্গল যে প্রকার বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় রাজস্বের হ্রাস গণনার মধ্যেই আসে না"। সামান্য ভূপালরাজ্যে যাহা সম্ভব হইল, সুবৃহৎ বৃটিষসাম্রাজ্যে তাহা যে সম্ভব হইতে পারে না, সে কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তিই হয় না।

১৯। হিন্দুশাস্ত্রে নিষেধবিধি।

ভূপালের বেগম মহোদয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে নিষেধবিধিপ্রবর্ত্তনে হিন্দুরা কোনও আপত্তি উত্থাপিত করে নাই। করিবে কেন? সুরাপানের বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বড়ই কঠোর বিধান দেখা যায়। হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"সুরাপান মহাপাতকের অন্যতম, এমন কি, সুরাপায়ীর সংসর্গও মহাপাতক"। "দ্বিজ মোহবশত সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরা পান করিবে; তাহা দ্বারা নিজদেহ নিঃশেষে দগ্ধ হইলে তবে পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। অথবা অত্যুষ্ণ গোমূত্র, জল, দুগ্ধ, ঘৃত বা গোময়রস পান করিয়া মৃত্যুলাভ করিবে। অথবা সুরাপানজনিত পাপমুক্তির জন্য কেশরচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং জটাধারী ও ধ্বজবাহী হইয়া সম্বৎসরকাল ক্ষুদকণা খাইয়া জীবনধারণ করিবে; অথবা রাত্রে একবার মাত্র তিলের খৈল খাইয়া থাকিবে। সুরা অন্নের মল এবং পাপই মলরূপে উক্ত হয়; অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য (এতদুপলক্ষিত সমগ্র মানবজাতি) সুরাপান করিবে না। গুড় পিষ্টকাদি বা মধুসংযোগে প্রস্তুত—সকল মদ্যই এক; কোন প্রকার মদ্যই পান করা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কর্ত্তব্য নহে। মদ্য, মাংস, সুরা ও আসব, এ সকল যক্ষ রক্ষ ও পিশাচদিগের খাদ্য, উহা ব্রাহ্মণদিগের ভক্ষ্য নহে। ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইলে অশুচি স্থানে পড়িবে এবং

নানা অকার্য্য করিবে, অতএব ব্রাহ্মণের মদ্যপান করা উচিত নহে—করিলে তাহার ব্রহ্মণ্য দূর হয় এবং সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়" (মনু, ১১ অধ্যায়)।

বিষ্ণু ঋষিও তাঁহার সংহিতায় বলেন—"সুরাপায়ী ব্যক্তি সকল কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া এক বৎসর ক্ষুদকণা খাইয়া জীবনধারণ করিবে" (বিষ্ণু সং. ৫১ অধ্যায়)। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় "German" শব্দ যেমন গালিরূপে ধরা হইত এবং কাহাকে German বলিলে বিচারালয়ে শাস্তি পাইতে হইত, সেইরূপ "সুরাপায়ী" বলিলে তাহার জন্য দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ছিল (যাজ্ঞ-সং, বা॰ পা॰ প্র॰)। গৌতম বলেন—"মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে মৃত্যু হইলে উহার পাপক্ষয় হইবে। যদি সে অজ্ঞান ও অনিচ্ছা সহ মদ্যপান করে, তবে তিন দিন ধরিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, উদক ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে এবং পুনরায় যথাশাস্ত্র উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইবে" (গৌতম সং. ২৪ অ)। শতাতপ ঋষিও তাঁহার সংহিতায় সুরাপায়ীর জন্য কঠিন দণ্ডবিধান করিয়াছেন (শাতা সং. ৩ অধ্যায়)।

সুরাপান পুরাকালে এতই হেয় দৃষ্টিতে দেখা হইত যে, আমার স্মরণ হইতেছে, মনুসংহিতায় অথবা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিয়াছিলাম যে, সুরাপায়ীর অন্যতর শাস্তি ছিল তাহার কণ্ঠে তপ্ত সীসক ঢালিয়া প্রাণদণ্ড। শৌণ্ডিকালয় বা মদের দোকান নগরের প্রান্তে মাত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইত, নগরের ভিতরে নহে। কেবল তাহাই নহে, রাজপথের যে ধারে মদের দোকান থাকিত, পথিকদিগকে সে ধারে না চলিয়া তাহার বিপরীত ধারে চলিবার বিধান দেওয়া হইত।

২০। সুরারাক্ষসীর নির্ব্বাসনে আত্মনির্ভর আবশ্যক।

উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, মদ্যপানের পরিণামে কুফল ব্যতীত সুফল হইতে পারে না; এবং উহা রহিত করিতে গেলে গবর্ণমেন্টের নিকটে বিশেষ কোন সাহায্য পাইবার আশা অতি অল্প, বরঞ্চ বাধা পাইবারই সম্ভাবনা সমধিক। অবশ্য একথা বলা অন্যায় হইবে না যে, এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট সহায় হইলে ভারতে নিষেধবিধি জারি করা সহজ হইবে, কারণ ভারতের অধিবাসীগণ ধর্ম্মে কর্ম্মে ভাবে ভক্তিতে সাধারণত মদ্যপানের বিরোধী। বর্ত্তমানে হিন্দু বা মুসলমান ভারতের অধিবাসী মাত্রেই বুঝিয়াছে যে, দেশকে সুরারাক্ষসীর হাত হইতে বাঁচাইতে চাহিলে, অবিলম্বে নিষেধবিধি জারি করা উচিত। কিন্তু গবর্ণমেন্টের নিকট যখন এবিষয়ে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়া সুদূরপরাহত, তখন দেশ হইতে মদ্যপান নির্ব্বাসিত করিবার যথার্থ ইচ্ছা থাকিলে দেশবাসীদের নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে, অর্থাৎ নিজেদের চেষ্টায় উহাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।

২১। ইংরাজ অভ্যুদয়ের সঙ্গে সুরাপানের প্রাদুর্ভাব।

বর্ত্তমান যুগে বলিতে গেলে ভারতে ইংরাজদিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে, অন্তত ইংরাজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে, এদেশে মদ্যপানের কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন এদেশে ইংরাজদিগের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দু স্কুল প্রভৃতির ভিতর দিয়া ইংরাজী শিক্ষা বড়ই বিস্তৃতি লাভ করিল, সেই সময়ে তৎকালীন ইংরাজদিগের অনুকরণে মদ্যপান নহে, মদে ডুবিয়া থাকা সভ্যতা ও ভদ্রতার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। সে সময়ে বিদেশীয় "হনুকরণের" ফলে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় মদের স্রোতে কি প্রকার হাবুডুবু খাইতেছিলেন, কি প্রকার "waded through tumblers of beer and wine", তাহা রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ "সেকাল ও একাল" প্রভৃতি গ্রন্থে উত্তরবংশীয়দিগের অবগতির জন্য স্থায়িত্ব-প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা তো বাল্যকালে দেখিয়াছি, মদ্যপান সেকালে fashion হইবার ফলে জ্ঞানে গুণে ধনে মানে দেশের শীর্ষস্থানীয় কত লোক একের পর এক করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলেন। আমরা কলেজ হইতে বহির্গত হইবার অনেক পরেও এই fashionএর ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মহিলারা পর্য্যন্ত মদ্য-পরিবেশন করিতেছেন।

২২। ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাধাপ্রদান।

যাই হৌক, মদের বন্যায় ভাসিয়া যাওয়া হইতে দেশকে রক্ষা করে ব্রাহ্মসমাজ। সুরাপানের কুফল দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্বপ্রথম তাহাতে বাধা প্রদান করে। ইহা জানা কথা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের পর অনতিবিলম্বে তাঁহার বন্ধুবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত একযোগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মদ্যপানে সর্ব্বপ্রথম বাধা প্রদান করেন। তাহার পর অবধি মদ্যপানকে সভ্যতার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা রহিত হইয়া গেল, বরঞ্চ তাহা বর্ব্বরতার চিহ্নরূপে গৃহীত হইতে লাগিল। আমরা যখন বিদ্যালয়ে নিম্ন-শ্রেণীতে পড়ি, তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অতুল

প্রতাপ। তিনিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পদানুসরণ করিয়া মদ্যপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম, নব্য ও প্রাচীন সকল সম্প্রদায়ের জন্য "আশাদল" বা Band of Hope নাম দিয়া একটী সুরাবিরোধী সংঘ সংগঠিত করিয়াছিলেন। সেই সংঘের প্রতিজ্ঞাপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিতেন, আমরা জানি, তাঁহাদের অনেকেই সুরা বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। সেদিন পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি যে, এক মদ্যবহুল নিমন্ত্রণে আহুত এক ব্যক্তি বহুকাল পূর্ব্বে ঐ আশাদলের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রকার মদ্য স্পর্শ করিলেন না। একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম যে, ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার কথা তিনি যেই উল্লেখ করিলেন, অমনি, সর্পের মুখে বিষনাশক প্রস্তর ধরিলে সর্প যেমন নির্বীর্য্য হইয়া যায়, সেইরূপ অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আর কথাটী না বলিয়া তাঁহাকে মদ্যপান হইতে রেহাই দিলেন।

২৩। প্রতীকারের উপায়—মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংঘবন্ধন।

শুনিয়াছি এই আশাদল এখনও নাকি বাঁচিয়া আছে, যদিও আমরা ইহার কোনই চিহ্ন দেখিতে পাই না। চক্ষু খুলিয়া যদি দেখ, তবে দেখিবে, সুরারাক্ষসী এখনও মরে নাই, বুক ফুলাইয়া সগর্ব্ব পদক্ষেপে অশিক্ষিত কুলি-শ্রেণী তো দূরের কথা, ছাত্র প্রভৃতি শিক্ষিতসমাজেও বিচরণ করিতেছে। লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়, ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যখন দেখি যে, অনেক ইঙ্গবঙ্গ পরিবারে মহিলারা পর্য্যন্ত বর্ম্মা চুরুটের ধূমপানে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উঠিয়া যান এবং অভ্যাগতদিগের সম্মুখে স্বহস্তে মদের গেলাস প্রভৃতি হাজির করিয়া অভ্যর্থনা করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। সুতরাং যদি আমরা নিজেরা বাঁচিতে চাই, যদি সন্তানগণকে সুরা-রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চাই, তবে আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া ঐ আশা-দলকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া অথবা উহারই অনুরূপ সংঘসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার বিরুদ্ধে দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধ না করিয়া সত্যনিষ্ঠার সহিত শিক্ষিত-অশিক্ষিতনির্ব্বিশেষে দেশবাসী সকলের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহার অপকারিতা বিশদরূপে বুঝাইয়া সুরার কবল হইতে দেশবাসীকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

২৪। কথায় ও কাজে মিল চাই।

কেবল বক্তৃতা দ্বারা ইহা সংসাধনের আশা নাই। মাদকনিবারণী সভায় সুরাপানের বিরুদ্ধে সুন্দর বক্তৃতা দিয়া ঘরে আসিয়া বন্ধুবর্গের নিকট আত্মজাহির করিবে, আর পরক্ষণেই খানসামাকে সোডাপানি ও ব্রাণ্ডিপানি আনিবার আদেশ দিবে, এরূপ করিলে চলিবে না। এই প্রকার মিথ্যাচারের ফলেই তো আমরা মরিতে বসিয়াছি। একদিকে আমরা কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছি, সন্তানদিগকে পদে পদে লেখাপড়া ছাড়াইয়া সত্যাগ্রহে দীক্ষিত করিতে উদ্যত হইতেছি, কিন্তু যদি আমরা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে শিক্ষা না করি এবং সন্তানগণকে শিক্ষা না দিই, তবে দেশের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

২৫। ভগবানের উপর একনিষ্ঠ হইয়া কার্য্যে, নিশ্চয় জয়লাভ।

উপসংহারে আমি এইটুকু বলিতে চাই—ভগবানের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, কথায় ও কাজে সর্ব্বথা মিল রাখিয়া, নিজেদের সকল কার্য্য সত্যনিষ্ঠার ভিত্তিতে গাঁথিয়া মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযান কর; কেবল সুরারাক্ষসী নহে, তাহার শতবিধ অনুচর-সহচরের বিরুদ্ধে অভিযান কর; অপ্রতিহতশক্তি ভগবান যদি থাকেন, তবে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে; তবে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা দেশবাসীর হস্তগত হইবে; তবে ভারতে স্বরাজ নিশ্চয়ই অচিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

দণ্ডবিবেক।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত "দণ্ডবিবেক" গ্রন্থ সম্প্রতি গুইকবার মহারাজার Oriental institute (প্রাচ্য বিভাগ) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভট্টপল্লীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রাচীন পাঁচখানি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পাঠ মিলাইয়া প্রাগুক্ত মহারাজার অর্থসাহায্যে উহা প্রকাশ করিয়া-ছেন। শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পি-এইচ-ডি, যিনি শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র, তিনি বরোদা oriental institute এর director অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষ হইতেছেন। উক্ত সভা হইতে ইতিমধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বাহির হইয়াছে। "দণ্ডবিবেক" অর্থে দণ্ডবিধি আইন (penal code)। হিন্দুরাজার আমলে কি ভাবে দোষীর বিচার ও শাস্তিবিধান হইত, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। একভাবে বলিতে গেলে গ্রন্থখানির যথেষ্ট মূল্য আছে।

বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কবি ভবেশের পুত্র ছিলেন। মিথিলায় বিষপকক-বংশে তাঁহার জন্ম। বর্দ্ধমান তীরভুক্তির (বিহারের অন্তর্গত বর্ত্তমান ত্রিহুত) রাজা ভৈরবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থ-প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্র উক্ত রাজার পত্নী জয়ার কৃপা-ভাজন ছিলেন। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, গণ্ডক মিশ্র বর্দ্ধমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং শঙ্কর ও মিথিলার বাচস্পতি মিশ্রের নিকট হইতে বর্দ্ধমান শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধাংশে আবির্ভূত হন। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, বর্দ্ধমানও ঐ সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে তাঁহার যে নিবন্ধ রচনা করিয়া যান, তাহাতে 'বর্দ্ধমান' নামের উল্লেখ আছে। বর্দ্ধমান অনেকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচনা করিয়া-যান, যথা;—দণ্ডবিবেক, দ্বৈতবিবেক, গঙ্গাকৃত্যবিবেক, পরিভাষাবিবেক, স্মৃতিতত্ত্ববিবেক, ধর্ম্মপ্রদীপ, স্মৃতি-পরিভাষা ইত্যাদি। "দ্বৈতবিবেক" গ্রন্থখানি ব্যবহার-শাস্ত্র (civil code) মাত্র; অন্যান্য গ্রন্থগুলি আচার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে। দণ্ডবিবেক গ্রন্থে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ, কাত্যায়ন, ব্যাস, বিষ্ণু হইতে অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকন্তু মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূকভট্ট, গোবিন্দরাজ, মেধাতিথি ও নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞের টীকা হইতে এবং মিতাক্ষরা নামক যাজ্ঞবল্ক্যের টীকা হইতে ও পুরাণকারগণের বচন হইতে ও অন্যান্য নিবন্ধকারের রচনা হইতে কোন কোন অংশ লওয়া হইয়াছে। চণ্ডেশ্বর ঠাকুর প্রণীত বিবাদ-রত্নাকর হইতেও স্থলবিশেষ লওয়া হইয়াছে। বিবাদরত্নাকর নামের পরিবর্ত্তে উহার শেষ অংশ অর্থাৎ "রত্নাকর" এই নামটুকু তিনি অনেক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন।

আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, তাহা মহা-মহোপাধ্যায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ ইংরাজি ভূমিকা হইতে। উক্ত ইংরাজি ভূমিকাসংকলনে তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য্য বি-এল, পিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বর্দ্ধমান যে কেবলমাত্র এই দণ্ডবিবেকের প্রণেতা ছিলেন তাহা নহে, গ্রন্থখানির সমাপ্তির পরে লেখা আছে "মহামহোপাধ্যায় ধর্ম্মাধিকরণিক-শ্রীবর্দ্ধমান-কৃতো দণ্ডবিবেকঃ সমাপ্তঃ"। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি ধর্ম্মাধিকরণিক অর্থাৎ নিজেই বিচারক ছিলেন; অন্ততঃ দণ্ডবিধানকার্য্যে রাজার মন্ত্রণাদাতা ছিলেন।

দণ্ডবিবেক-গ্রন্থে চারিপ্রকার শাস্তির বিধান আছে। গ্রন্থকার বৃহস্পতির বচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন যে,

> বাগ্ ধিক্ ধনং বধশ্চৈব চতুর্দ্ধা কথিতো দমঃ।
> পুরুষং বিভবং দোষং জ্ঞাত্বা তং পরিকল্পয়েৎ॥

দণ্ড চতুর্ব্বিধ—বাক্‌দণ্ড, ধিক্‌দণ্ড, ধনদণ্ড, কায়দণ্ড। দোষীর (সামাজিক) অবস্থা ও তাহার অর্থ, (অন্য-দিকে) দোষের মাত্রা বুঝিয়া তাহাকে দণ্ডবিধান করিবে। বর্দ্ধমান বৃহস্পতির ঐ বচনের উপর নিজের ব্যাখ্যা দিয়াছেন—বাক্‌দণ্ড অর্থে "ন স্বয়েদং সম্যক্ কৃতং" ইত্যাদি নিন্দা; দোষীকে এই কথা বলা হইবে যে "তুমি এটি ভাল কর নাই" এই বলিয়া তাহাকে তাড়না করিবে। ধিক্‌দণ্ড অর্থাৎ "ধিক্ ত্বাং পাপীয়াংসম্ অকার্য্যকারিণম্ ইত্যাদি ভৎসনম্"; তুমি পাপী, তুমি অকার্য্যকারী তোমাকে ধিক্; ইংরাজীতে যাহাকে বলে warned and let off। ধনদণ্ড—"ধনং দ্বিবিধং ব্যবস্থিতং অব্যবস্থিতং চ। তত্র ব্যবস্থিতং নিয়ত-সংখ্যং সাহসরূপং, তৎ ত্রিবিধং প্রথমং মধ্যমম্ উত্তমম্ ইতি"। ধনদণ্ড প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি স্থির অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট আর একটি অনির্দ্দিষ্ট। নির্দ্দিষ্ট জরিমানা আবার তিন ভাগে বিভক্ত; দোষের পরিমাণ অনুসারে অল্প মধ্যম ও অধিক। 'সাহস' শব্দের অর্থ দোষ বা অপরাধ। বধদণ্ড অর্থাৎ কায়দণ্ড আবার তিন ভাগে বিভক্ত—"পীড়নম্ অঙ্গচ্ছেদঃ প্রমাপণঞ্চ (মারণং)। পীড়নং চতুর্ব্বিধং—তাড়নম্ অবরোধনং বন্ধনং বিড়ম্বনঞ্চ; তাড়নং কশাদি-অভিঘাতঃ, অবরোধনং কারাবাসাদিনা কর্ম্ম-নিরোধঃ, বন্ধনং নিগড়াদিভিঃ অস্বাতন্ত্র্য-উৎপাদনং। বিড়-ম্বনম্ অনেকপ্রকারং—যথা মুণ্ডনং, গর্দ্দভারোহণং, চৌর্য্যাদি-চিহ্নাচরণং, ডিণ্ডিমাদিনা তদপরাধখ্যাপনং পুরনগরভ্রামণম্ ইত্যাদি"; অর্থাৎ কায়দণ্ড অর্থে পীড়ন, অঙ্গচ্ছেদ ও মৃত্যু-দণ্ড। পীড়ন আবার চারি প্রকারের—(১) তাড়ন, (২) কারাবাস, (৩) বন্ধন, (৪) নানাভাবে নির্য্যাতন। তাড়ন অর্থে বেত মারা, অবরোধ—কারাবাসাদি দ্বারা কর্ম্মনিরোধ; বন্ধন অর্থে রজ্জুবন্ধনাদি দ্বারা অপরাধীর স্বাধীনতাবিলোপ; বিড়ম্বন অর্থে মস্তকমুণ্ডন, গাধায় চড়ান, চোর বলিয়া গায়ে তপ্ত লৌহ দ্বারা ছাপ লাগান, নাগ্‌রা অর্থাৎ ঢোল পিটিয়া দোষীর অপরাধ জ্ঞাপন ও তাহাকে নগরের মধ্যে ঘোরান। "অঙ্গচ্ছেদশ্চ ছেদ্যাঙ্গভেদাৎ চতুর্দ্দশবিধ ইতি বৃহস্পতিঃ"। বৃহস্পতির বচন অনুসারে অঙ্গচ্ছেদ ১৪ প্রকারের, যথা;—হস্ত, অঙ্ঘ্রি, লিঙ্গ, চক্ষু, জিহ্বা কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বার অর্দ্ধাংশ, পদের অংশ সংদংশ (পদার্দ্ধ) অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ (অঙ্গুলি) ছেদ, ললাট, ওষ্ঠ • • কটি। প্রমাপণ অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড আবার দ্বিবিধ, খড়্গাঘাতাদি দ্বারা মারা, শূলারোপণাদি অর্থাৎ শূলে চড়াইয়া মারা।

ধনদণ্ডের বিধান এইরূপ যে, প্রথম অপরাধের জন্য ২৪ পণ হইতে ৯১ পণ পর্য্যন্ত। মধ্যম সাহস বা অপরাধের জন্য দুই শত হইতে পাঁচ শত পণ পর্য্যন্ত, উত্তম সাহসের জন্য ছয় শত হইতে এক হাজার পণ পর্য্যন্ত। "পণ"শব্দে কোন বিশেষ ওজনের তাম্রমুদ্রা। "মাস" ওজনে পণের বিশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যেখানে মাসশব্দের প্রয়োগ আছে, বুঝিতে হইবে উহা স্বর্ণের; এবং যেখানে মাসকের প্রয়োগ আছে বুঝিতে হইবে উহা রূপার। নিষ্ক স্বুবর্ণনির্ম্মিত। যেখানে "শতং দণ্ডাঃ" এইরূপ উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে "শতপণং দণ্ডাঃ"।

যাহা প্রকৃত অপরাধ (crimes proper) তাহাই দণ্ডবিবেকে দণ্ডনীয়। প্রকৃত অপরাধ অর্থে বুঝিতে হইবে, যাহা চরমুখে অর্থাৎ প্রহরীগণ (পুলিশ) কর্ত্তৃক রাজার গোচরীভূত হয়; এবং রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক বিচারের জন্য বিচারকর্ত্তার নিকট আনীত হয় (কোন পক্ষের আবেদন মতে নহে)। টাকা কর্জ্জ লইয়া তাহা সহজে প্রত্যর্পণ না করিলে যে অপরাধ হয়, তাহা দণ্ডবিবেকের অন্তর্গত নহে। কিন্তু কেহ প্রকৃত পক্ষে দেনা লইয়া যদি অস্বীকার করে, তবে মিথ্যাভাষণের জন্য দণ্ডবিবেক অনুসারে সে দণ্ডনীয় ও সাজা পাইবার উপযুক্ত। দ্বৈতবিবেক বা ব্যবহারশাস্ত্র দেওয়ানি আইনের নামান্তর। দেওয়ানি আইনের বিচারালয়ে কাহার কত প্রাপ্য ইত্যাদি বিষয়ের বিচার হইবে। ঐ দ্বৈতবিবেক গ্রন্থখানি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। উহার অনুসন্ধান চলিতেছে।

সামান্য চুরির অপরাধে হৃত দ্রব্যের পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদণ্ড। ধান্যচুরির অপরাধে নিম্নপক্ষে দণ্ড দশ কুম্ভ। এক কুম্ভের পরিমাণ প্রায় ৬৪ সের। আচার্য্য, পুরোহিত, ব্রহ্মচারী, রাজা, বালক, বৃদ্ধ, ভীষণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আদৌ দণ্ডনীয় নহে। এখানে King can do no wrong রাজা অপরাধ করিতে পারেন না, রাজা কথাটির উল্লেখ থাকাতেই এই কথাটুকু মনে পড়ে। দণ্ডবিবেকে রাজা ছাড়া আরও কয়েকজন দণ্ড পাইবার যোগ্য নহেন, তাঁহারা দণ্ডের অতীত ইহা দেখিতে পাই। ফলত তাঁহাদের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা প্রায় ছিল না।

ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানির দণ্ড ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধে জেল ও অঙ্গে তপ্ত শলাকার সাহায্যে দাগ দিবার ব্যবস্থা ছিল। ভীষণ অপরাধের জন্য তাঁহাদের নির্ব্বাসন-দণ্ডও হইত। চৌর্য্যাদি করিবার চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে দণ্ডের পরিমাণ চতুর্থাংশ মাত্র। যদি কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ডের পরিমাণ ব্যক্তিগত অপরাধের দ্বিগুণ। যাহারা অস্পৃশ্য জাতির অন্তর্গত তাহাদের পক্ষে অর্থদণ্ড বিহিত নহে। যাহারা ব্যবসায়ী, কারিকর ও যোদ্ধা, তাহাদিগকে তাহাদের যন্ত্র বা অস্ত্র হইতে ঘরবাড়ী শয্যা অলঙ্কার ও পরিধেয় বস্ত্র হইতে বঞ্চিত করিবার দণ্ডবিবেকে বিধান নাই। সর্ব্বস্ব অপহরণ যে যে অপরাধের শাস্তি, সেখানে রাজা সম্পত্তির কেবলমাত্র তিনচতুর্থ গ্রহণ করিবেন ও অপরাধীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বাকী চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিবেন। যাহারা অপরাধের জন্য দৈহিক শাস্তিতে দণ্ডিত, তাহারা অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে, ইহারও বিধান আছে। যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, সে একশত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে। অঙ্গচ্ছেদ যাহার পক্ষে ব্যবস্থা, সে পঞ্চাশ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া এবং যে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত সে পঁচিশ স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা দিলে মুক্তি পাইত।

মনে রাখিতে হইবে, সে সময়ে এত অধিক পরিমাণ অর্থদণ্ড দেওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। যদি কাহারও উপর অর্থদণ্ড হইত, সে তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে তৎপরিবর্ত্তে জেল খাটিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণদের পক্ষে এইটুকু স্ুবিধা ছিল যে, তাহারা একেবারে সমস্ত জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে তাহাদের সম্বন্ধে কিস্তিবন্দীতে জরিমানার টাকা আদায় দিবার ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণবধ করিলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইত। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকে বধ করিলে তাহাদের দণ্ডের পরিমাণ যথাক্রমে এক হাজর গাভী হইতে দশটি গাভী পর্য্যন্ত। অন্যজাতীয়া স্ত্রীবধ- বা ইতর পশুহত্যার জন্য শাস্তি শূদ্রবধের তুল্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অকারণ প্রাণীহত্যা সে সময় দণ্ডনীয় হইত। যদি কয়েকজন মিলিয়া অপরের সহিত বিবাদ করিতে করিতে একজনের প্রাণসংহার হইত, তবে যাহার হস্তে মৃত্যু ঘটিয়াছে সে বধকারী। সে ত দণ্ড পাইবেই; আর যাহারা তাহার সহকারী তাহাদের প্রত্যেকের দণ্ড বধকারীর দণ্ডের অর্দ্ধেক। বধকারীর দলস্থ লোকের সংজ্ঞা "আরম্ভকৃৎ, সহায়ঃ, আশ্রয়ঃ, দোষভাক্, মার্গানুদেশকঃ, শস্ত্রদাতা, যুদ্ধোপদেশকঃ, অনুমোদকঃ"। ইহাতে বুঝা যায় এখনকার মত aiding and abetting যাহারা করিত, তাহাদেরও নিস্তার ছিল না। অনেকে বলিতে চান যে, হিন্দু আমলে ব্রাহ্মণগণ আদৌ দণ্ডনীয় হইতেন না। দণ্ডবিবেক-পাঠে তাঁহাদের সে ভ্রান্তি ঘুচিবে। দণ্ডবিবেক হইতে দর্শনীয় আরও অনেক আছে এবং চিন্তা করিবারও যথেষ্ট বিষয় আছে।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

(সমালোচনা—৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

এই গ্রন্থ, এবং ইহার পরে যে গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে, এই দুই গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা একটা আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা সচরাচর বাঙ্গলা গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে লেখকদিগেরও অসুখ, আমাদিগেরও অসুখ। লেখক মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে "আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, অনিন্দনীয় এবং রামায়ণ হইতে আজি পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট"। সমালোচক যদি ইহার অন্যথা লেখেন তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীমধ্যে যত দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপীড়া জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালি গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগের আমরা প্রশংসা করি না, অপ্রশংসা দেখিয়া লেখকসম্প্রদায় আমাদিগের প্রতি রাগ করেন। সভ্যজাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন; দুই-একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালী অন্য যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হউন না কেন, কলহে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন। সমালোচনায় অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ-সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জ্জনীয়। যে দেশে অল্পকাল হইল, কবির লড়াই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল—যে দেশে অদ্যাপিও পাঁচালি প্রচলিত, যে দেশের লোক অশ্লীল গলিগালাজ ভিন্ন অন্য গালি জানে না, সে দেশের ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপনাপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কখনও কখনও দেখিয়াছি যে মহাসম্ভ্রান্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনার সম্মানের ত্রুটি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন এবং মাতৃভাষাকে কলুষিত করিয়াছেন। কখনও কখনও দেখিয়াছি, রাগান্ধ লোকেরা সমালোচনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও অক্ষম। যদি আমরা কোন পুস্তকান্তর্গত চর্ব্বিতচর্ব্বণকে ব্যঙ্গ করিয়া "নূতন" বলিয়াছি, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার কথাগুলিকে নূতন বলিয়াছি! যদি কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চার হয়, এমত কথা পাঠ করিয়া তাহা "দুর্জ্ঞেয়" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, অমনি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, আমার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সত্য সত্যই দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। সুতরাং তিনি অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে তাঁহার কথাগুলি অতি প্রাচীন এবং সকলেরই জ্ঞানগোচরে। কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপরিচিত লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষ্যাবশতঃই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এসকল রহস্যে বিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলি ভালমানুষকে যে মনঃপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক সমালোচনা আমাদিগের বড় অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হাতে পড়ে, আমরা প্রশংসা করিয়া লেখকসমাজকে জানাই যে আমরা বিশ্বনিন্দক নহি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থ অতি বিরল। অদ্য দুইখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাই আজি আমাদিগের এত আহ্লাদ। তাহার মধ্যে রাজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থখানি প্রথমেই সমালোচনীয়।

হিন্দুধর্ম্ম যে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, এই কথা প্রতিপন্ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গত ভাদ্রমাসে জাতীয়-সভায় রাজনারায়ণ বাবু উপস্থিত মতে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাহা স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতেই এ প্রস্তাবের উৎপত্তি।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচার কালে কার্য্যাধ্যক্ষ সাধারণ সমক্ষে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, এই পত্রে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ, সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন না করিলে আমরা এ প্রবন্ধের উপযুক্ত সমালোচনা করিতে পারি না, কেননা তাহা করিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের দোষগুণ বিচার করিতে হয়। অতএব আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না, ইহা আমাদের দুঃখ রহিল।

কিন্তু সে তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়াও যদি একজন হিন্দুবংশজ লেখক বলেন, যে আমাদের দেশের ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা একজন সুপণ্ডিত লোকের নিকট শুনিয়া সুখ হইল, তবে বোধ করি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা বলিতেছি, একথা শুনিয়া আমাদের সুখ হইল, কিন্তু একথা আমরা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি না, বা অযথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছি না। হিন্দুধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিনা, তদ্বিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া, নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে।

লেখক যাহাকে স্বয়ং হিন্দুধর্ম্ম বলেন, তাহারই শ্রেষ্ঠত্বসংস্থাপনই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহা অবশ্য অনুমেয়। তিনি বলেন যে ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এদেশের সাধারণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্ম্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্ম্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।

রাজনারায়ণ বসু নিজপ্রশংসিত ধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মূল হিন্দুশাস্ত্রে আছে, ইহা যথার্থ। কিন্তু উহা হিন্দুধর্ম্মের একাংশমাত্র, অতি অল্পাংশ। কোন পদার্থের অংশমাত্রকে

সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিঘ্ন হয়। অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থেরই প্রশংসা করা যায়। রাজ-নারায়ণ বাবু যেমন হিন্দুধর্ম্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধর্ম্মের অপ-রাংশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেমন অঙ্গুরীয় মধ্যস্থ হীরককে অঙ্গুরীয় বলা যায় না, তেমনি ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না। যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপাসনাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায় না। উপধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পরিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা কোনকালে একা ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বা আধুনিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিনা, সন্দেহ। যদি একথা যথার্থ হয়, তবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতাসংস্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বোধ হয় রাজনারায়ণ বসু একথা অস্বীকার করিবেন না।

ইহাতে আমরা লেখকের অপ্রশংসা করিতেছি না, স্বমতসংস্থাপনে সকলেরই অধিকার আছে। বিশেষ ব্রাহ্ম পরিবর্ত্তে হিন্দু কথাটী ব্যবহারে বিশেষ উপকার আছে। হিন্দুধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের একতা স্বীকার করায় আমাদের বিবেচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মঙ্গল। আমি যদি অন্যের সহিত পৃথক হইয়া, একা কোন সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একারই উপকার, যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে সকলেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটা নূতন সম্প্রদায়স্থাপনের অপেক্ষা বহুলোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মের পরিশোধন ভাল। কেননা তাহাতে বহুলোকের ইষ্টসাধন হয়। আমরা হিন্দু, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি ; কোন সম্প্রদায়ের আনুকুল্যে একথা বলিলাম না ; হিন্দুজাতির আনুকূল্যেই একথা বলিলাম।

অন্যান্য বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি বলিয়া গ্রন্থকারের রচনার প্রশংসা করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। এই প্রবন্ধের রচনাপ্রণালী অতি পরিপাটি। লেখক অতি পরিশুদ্ধ, অথচ সকলের বোধগম্য এবং শ্রুতিসুখদ ভাষায় আপন বক্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। মিথ্যা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কথায় সুচারুরূপে কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার সংগ্রহও প্রশংসনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রবন্ধের শেষভাগে সন্নিবেশিত জয়োচ্চারণ আমাদের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। ইহাতে নূতন কথা কিছু নাই, কিন্তু এরূপ পুরাতন কথা যদি হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তবে তাহাতেই আমাদের সুখ। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় হইতে একথা নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই তাহাতে আমাদের সুখ।

"আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দু-জাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্টন তাঁহার স্বজাতীয় উন্নতির জন্য একস্থানে বলিয়াছেন,—Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible looks ; methinks I see her as an eagle mowing her mighty youth and kindlling her undazzled eyes at the full mid-day heaven.

আমি সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত-খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।
রূপবতী সাধ্বী সতী ভারতললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা দময়ন্তী পতিব্রতা
অতুলনা ভারতললনা।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগুতপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস ভবভূতি কালিদাস
কবিকুল ভারতভূষণ।
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।
কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়
যতো ধর্ম্মস্ততোজয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক্ ভারতের জয় ইত্যাদি।"

রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক, হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব-পশ্চিমসাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটী ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।*

* ১২৭৯ সালের চৈত্র-সংখ্যা "বঙ্গদর্শন" হইতে উদ্ধৃত।

সংবাদ।

বর্ষশেষে ব্রাহ্মসমাজ। বিগত ৩০শে চৈত্র সোমবার বর্ষশেষ উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যার পরে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ উপাসনান্তে "রামমোহন রায়ের সহজ সাধন" বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বেদী হইতে আচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় "বর্ষচিন্তা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজে বর্ষশেষ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পন্ন করেন। বেহালা-ব্রাহ্মসমাজেও ঐদিন শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

নববর্ষে ব্রাহ্মসমাজ। নববর্ষ উপলক্ষে প্রভাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "নববর্ষের বাণী" বিষয়ে যে উপদেশ বিবৃত করিয়াছিলেন, উহা আগামী জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বেহালাব্রাহ্মসমাজে নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঐদিন সন্ধ্যার পরে আদিব্রাহ্মসমাজে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। তদুপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীগ্রহণ করেন। স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনান্তে ক্ষেমেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতা আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম কি?" প্রবন্ধ পাঠ করেন; উক্ত বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল; উহা পত্রিকায় স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বেহালা-ব্রাহ্মসমাজে সায়ংকালে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীগ্রহণ করেন এবং শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগ।—আমরা অতীব আনন্দের সহিত অবগত হইলাম যে, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত P.H. D. সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী গুণী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেন্ট খুবই সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন; আমরা শুনিয়াছিলাম, ঐ পদে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে বলিয়া অল্পবিস্তর আন্দোলন উপস্থিত করা হইয়াছিল। এরূপ কোন সিদ্ধান্ত হইলে আন্দোলনকারীদিগের বড়ই সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া হইত এবং গভর্ণমেন্টেরও অবিবেচনার কার্য্য হইত। ইহা জানা কথা যে, মহামতি কাউয়েল, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়া সংস্কৃত কলেজের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে আমরা কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী নহি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ডাঃ দাসগুপ্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের বহুবিধ উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

পারিবারিক উপাসনা।—গত ১১ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় ৩৮ নং বিডন-রো-নিবাসী শ্রীঅনাথবন্ধু শীল মহাশয়ের গৃহে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে যে পারিবারিক বিশেষ ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন হইয়াছিল, উহাতে আহূত হইয়া পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "ধর্ম্মের স্বাভাবিকতা" বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। উপাসনান্তে অনাথবাবু ছায়াচিত্রে ব্রাহ্মসমাজের পুরাকাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। এইরূপ পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতি গৃহে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।—গত ৩০শে বৈশাখ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষে তদীয় পুত্র শ্রীহৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বকীয় ভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

৺সৌদামনী দেবী।—আমরা এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম যে, ভক্তিভাজন রেভারেণ্ড ভাই ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মাহাশয়ের পত্নী চতুরশীতি-বর্ষীয়া সৌদামিনী দেবী আততায়ীর হস্তে গত ১৩ই বৈশাখ রবিবার গভীর রাত্রে নিহত হইয়াছেন। তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ গত ২০শে বৈশাখ প্রাতে শান্তিকুটীরেই সম্পন্ন হয়। অনেকগুলি ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার সমাগম হইয়াছিল। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু ব্রাহ্মসাধারণের অন্তরে গভীর বিষাদের রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

৺আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর আচার্য্য আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া গত ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবারে পরলোকগত হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণবিধান করুন।
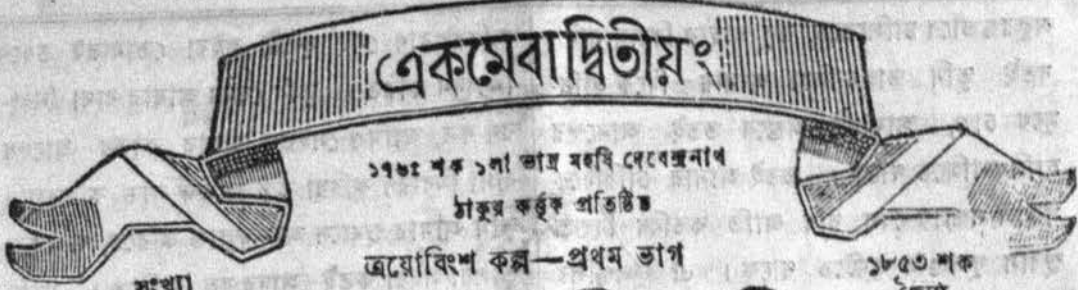
ওঁ তৎসৎ

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৪

১৮৫৩ শক জ্যৈষ্ঠ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬৯। অদর্শনে ও দর্শনে।

মা! ঘুম যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তুমি যদি কাছে থাক, তবে আমি তোমার আরও কাছে যাইতে চেষ্টা করি। আর তুমি যদি কাছে না থাক, তবে আমি ছুটিয়া বাহিরে আসি। যদি বাহিরে দেখিতে পাই, তবে আনন্দে অধীর হই। যদি দেখিতে না পাই, তবে কাঁদিয়া আকুল হই—সে কান্নার আর বিরাম নাই। তখন প্রাণের ভিতর কি যে ঝড় বহিয়া যায়, তাহা আমি জানি আর তুমি জান। তখন মেঘ হইতে ঘন ঘন বাজ পড়িয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করে এবং তাহার ভীষণ গর্জ্জনে আমার প্রাণে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তখন তুমিই তো তোমার দুই বাহু দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত রাখ আর আমাকে বাঁচাইয়া দাও। শরতের সুনির্ম্মল প্রভাতে কনক তপনের অরুণ জ্যোতির মত তোমার মুখের জ্যোতি তখন আমার প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়া সমস্ত আতঙ্ক বিদূরিত করে—দুঃখ-বিষাদের ঘন অন্ধকার সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়। শেষকালে ঐ একই কথা আমার প্রাণে জাগিয়া উঠে—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার প্রসন্ন মুখে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, আর আমাকে কোলে তুলিয়া বুকে লইয়া আদর কর—তুষ্টিতে পুষ্টিতে আমার সকল অঙ্গ ভরিয়া উঠুক।

৭০। তোমায় ভালবাসি।

মা! আমি তোমায় বড় ভালবাসি। তোমায় যে কত ভালবাসি, তাহা আমি নিজেই জানি না। শুধুই জানি আর বলিতে পারি যে—এতটা—এতটা ভালবাসি। এত ভালবাসা কোথা হইতে আসিল, কে হৃদয়ে আনিয়া দিল, কিছুই তো জানি না। কেবল জানি—তোমার স্তন্য যতই পান করি, সেই স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে আমারও ভালবাসা নিবিড় হইয়া সকল দিকেই বাড়িয়া চলিতে থাকে, আর জমাট বাঁধিতে থাকে। তোমার স্তন্যেরও শেষ নাই, আমার ভালবাসা বৃদ্ধিরও অন্ত নাই। যখন চাঁদের দিকে চাহিতে চাহিতে আত্মহারা হইয়া যাই, তখন মনে হয়, আমারই মত উহাকেও তুমি স্তন্যপান করাইয়া সুধাধারায় ভরিয়া দিয়াছ, তাই সে আজ অক্ষয় সুধাধারার উৎস হইয়াছে—জগতে সুধাধারা

অকুরন্তভাবে ঢালিতেছে, তবু তাহার বিরাম নাই। যতই তুমি ভালবাসিয়া আমার দিকে হাসিমুখে চাও, আমারও অন্তরে ততই আনন্দের হাসি জাগিতে থাকে। ততই আমার চারিদিকে সকাল-সন্ধ্যায় বেল যূথি জাতি কতবিধ বিশুভ্র সুবাস ফুলগুলি ফুটিতে থাকে। ঐ ফুলগুলির ভিতরে তোমারই প্রসন্ন মুখের বিমল হাসি দেখিতে দেখিতে এতই অধীর হইয়া উঠি যে, প্রাণের ভিতর আনন্দের এতই ছটফটানি হয় যে, কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারি না—শেষে কাঁদিয়া ফেলি, তবে সেই অধীরতা দূর হয়। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, তাহার তো শেষ দেখি না। আমার প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তাহারও তো অন্ত দেখি না, আদিও দেখি না। অনাদি যুগ অবধি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যেন সেই ভালবাসা তোমার আর আমার ভিতরে মাখামাখি হইয়া চলিয়াছে। অথচ তাহাকে হাতড়াইয়া কিছুই ধরিতে পারি না। অনন্ত আকাশের পরতের পর পরতের দিকে যখন আনমনে চাহিয়া থাকি, তখন মনে হয়, বুঝি সেই ভালবাসার একরত্তি আমারই বুকের মাঝে হাতড়াইয়া পাইয়াছি—সেই একরত্তিকে পাইয়াই আমি আনন্দে অধীর হই, সেই একরত্তি ভালবাসা আমার প্রাণের অন্তরে যে তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে, বুঝি সাগরের উত্তাল তরঙ্গও তাহার নাগাল পায় না। তোমারই ঐ ভালবাসার উপর আমার সকল আশাভরসাই অবলম্বিত। আমার প্রাণের যাহা কিছু গোপন কথা, সে সমস্তই আমি আমার ভালবাসার কোমলদলে মুড়িয়া তোমার ঐ ভালবাসার মধ্যে রাখিয়া দিলাম। জীবনের শেষ দিনে ভবের খেলা সাঙ্গ হইলে তুমি যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন সেগুলি তোমার কাছে চাহিয়া লইয়া দেখিব যে, তোমার ভালবাসার উত্তাপে সেগুলি কেমন ফুটিয়া উঠিল।

৭১। পূজার ফুল।

মা! আমার বড় ইচ্ছা যে, আমি পূজার ফুল হইয়া ফুটি। তখন হয় তো আমারই মত কোন অস্থিরপরাণ সেই ফুলটী লইয়া তোমারই চরণে নিবেদন করিত। তুমি যেমন আমার ব্যথা নিবারণ কর, আমিও সেইরূপ তাহার কাতর প্রাণের ব্যথা নিবারণ করিয়া কত আনন্দ লাভ করিতাম। তুমি আমার সুবাসে আনন্দলাভ করিতে, আমাকে তুলিয়া লইয়া কতই আদর-যত্ন করিতে। আমি তোমার সেই আদর-যত্নের মধ্যে তোমারই হাতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতাম। মরিয়াও সুখী হইতাম, আনন্দে উৎফুল্ল হইতাম।

৭২। ক্রোড়ে।

মা! লোকে ভাবে আমি একাজ সেকাজ কত কাজই করিতেছি। কিন্তু আমি তো দেখি না যে, আমি কি কাজ করিতেছি। কেবলই তো দেখি যে তোমারই কোলে ঘুমাইয়া আছি—যুগযুগান্তর ধরিয়া ঘুমাইয়া চলিয়াছি। মনে হয়, যেমন অনাদি কাল হইতে ঘুমাইয়া আসিয়াছি, অনন্ত কালও তেমনি ঘুমাইয়া চলিব। আমি তো দেখি, এই প্রকার তোমার কোলে ঘুমাইয়া থাকাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ। কি শান্তি—কি গভীর শান্তি! যে সন্তান মায়ের কোলে নির্ভয়ে শয়ন করিয়া না ঘুমাইয়াছে, এই শান্তির কথা সে কখনই বুঝিতে পারিবে না। মা! তোমার আনন্দাশ্রুতে যখন মধ্যে মধ্যে আমাকে স্নান করাইবার জন্য জাগাইয়া তোল, তখনই যা' আমি জাগিয়া উঠি—জাগিবার অন্য কোন অবসরই আমার থাকে না—দুই মুহূর্ত্তের জন্য হাত-পা নাড়ি, আবার পরক্ষণে তোমারই কোলে সুখনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ি। এই সুখনিদ্রার মাঝে তোমারই স্নেহের স্তন্যপান করিয়া তুষ্টি পুষ্টি সকলই লাভ করি। আবার এই সুখনিদ্রারই মাঝে স্বপ্নে-স্বপ্নে তোমার সঙ্গে কত-না কথা বলি, তুমিও আমার সঙ্গে কত-না কথা কও—আমাদের উভয়ের মধ্যে আনন্দের কি এক আশ্চর্য্য রসধারা বহিয়া যায়। হেথাকার লোকেরা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা প্রভৃতির জ্যোতির উপর কত-না স্তবস্তুতি কত-না কবিতা রচনা করে। কিন্তু তোমার প্রসন্ন মুখের যে জ্যোতি আমায় অন্তরে বাহিরে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিকট এ সকলের জ্যোতি পৌঁছিতে পারে না। সে জ্যোতি যেমন

এক দিকে শতসূর্য্যের প্রখরতা ধারণ করে, তেমনি তাহা সহস্র চন্দ্রের স্নিগ্ধ কোমলতা বহন করিয়া আনে। আবার সেই জ্যোতিই অযুতকোটি গ্রহতারকা হইতে ঘুমপাড়ানি মন্ত্র আনিয়া আমার চক্ষে বুলাইয়া দিয়া যায়। আমি আর কিছুই চাহি না। কেবল এইটুকু চাহি যে, এখন তোমার কোলে যে প্রকারে ঘুমাইয়া চলিয়াছি, চিরকাল যেন এই প্রকার ঘুমাইয়াই চলিতে পারি। তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও। তোমার চরণ আমার বক্ষে স্থাপন কর। আমি আমার সমস্ত হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া—প্রাণ ভরিয়া তোমার ঐ চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

৭০। পথ।

মা! লোকে বলে, তোমার কাছে যাইবার নাকি অনেক পথ আছে! আমি কিন্তু একটী পথ ছাড়া আর কোন পথই তো দেখিতে পাই না। আমার লক্ষ্যও একই তুমি, তোমাতে পৌঁছিবার পথও আমি একটী মাত্রই জানি। তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়াই আমার সেই একমাত্র সরল পথ। দিনের আলো যখন নিভ-নিভ হইয়া আসে, সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর প্রাণ যখন একটুখানি শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, তখন তোমার ঐ কোলে বারেকের জন্য উঠিতে প্রাণের ভিতর কি রকম আকুলি-বাকুলি লাগিয়া যায়। যখন দেখি সন্ধ্যাসমাগমে পাখী-গুলি নিজ নিজ বাসায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আমারও প্রাণ তোমারই কোলে একটুখানি আশ্রয় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সন্ধ্যাবেলায় আমার প্রাণে কান্না উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে—তুমি একবার কোলে লইয়া স্নেহচুম্বনে সমস্ত কান্না নিঃশেষ করিয়া দাও। তোমার ঘরে আমাকে লইয়া চল, সেখানে তোমার নামের অফুরন্ত গান আমি শুনিব আর শিখিব। হৃদয় যখন আনন্দে অধীর হইবে, অথবা দুঃখবিষাদে মলিন হইবে, তখন সেই সমস্ত গান আমি গাহিব আর তোমাকে শুনাইব। সংসারের কোলাহল কলরব হইতে আমাকে উদ্ধার কর। জীবনের যাহা কিছু বোঝা তাহা আমার দুর্ব্বল মাথা হইতে তুলিয়া লও। আমার জীবনে এখন কোনই কামনা বাসনা নাই। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা যে ছন্দে নৃত্যগীত করিতে করিতে চলিয়াছে, এখানে ধরাপৃষ্ঠে ফুলেরা বাতাসের সঙ্গে তালে তালে যে ছন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, আমি সেই ছন্দে তোমার নাম গাহিতে গাহিতে তোমারই কোলে ঘুমাইয়া পড়িতে চাই। সংসারের এ পারে সে ছন্দ কেহই শিখিতে চাহে না। তাই আমি তোমার কাছে নির্জ্জনে সেই ছন্দ শিখিতে চাই, যাহাতে সেই ছন্দে প্রাণের কথা সংযোজনা করিয়া যথা-সময়ে তোমাকে শুনাইতে পারি, আর তোমার কাছে উৎসাহ পাইতে পারি। মা! আমার এই ভগ্ন জীর্ণ তরীতে পাল তুলিয়া দিয়াছি। তুমি ইহার হালটী ধরিয়া যে কূলে উঠিলে নিত্য তোমার চরণ পূজা করিতে পারি, সেই কূলে উহাকে লইয়া যাও।

নববর্ষের বাণী।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

এই যে নববর্ষ শ্যাম ও শুভ্ররূপে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহার একটী বাণী আছে; আমাদিগকে জানাইবার ইহার একটী কথা আছে। অনন্তের দেশ হইতে সমাগত এই অতিথির সেই বাণী হইতেছে প্রাণের বাণী, নবীনতার বাণী—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের মাঝে উত্তীর্ণ হইবার বাণী।

"আস্তং বৈ মৃত্যুনা সর্ব্বং" জগতের সকল বস্তুই মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত। কালের স্পর্শ হিম-শীতল মৃত্যুর স্পর্শ। জগতের সকল বস্তুই ইহার স্পর্শে প্রাণ হারায়—পলে পলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয়। তাই জগতে যাহারা বাঁচিতে চায়, থাকিতে চায়, তাহাদের এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার কৌশলটী অবগত না হইলে চলে না। সেটী হইতেছে পলে পলে জমিয়া ওঠা মৃত্যুবাধাকে প্রাণের স্রোতোবেগে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া। সৃষ্টির সর্ব্বত্র প্রাণের এই জয়যাত্রা—এই লীলা, মৃত্যুর সহিত জীবনের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম-ধারা চলিয়াছে। যাহার মাঝে প্রাণের এই গতি

থামিয়া আসিতেছে—মৃত হইয়া গিয়াছে, সে-ই মৃত্যুগ্রস্ত "গ্রস্তং বৈ মৃত্যুনা"। জগতে তাহার স্থান নাই—সৃষ্টির সে বাধা। ইহাকে যত সত্বর পার বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হও—প্রাণের গতিপথের ঐ শিলাস্তূপ অপসারিত কর, তপস্যা দ্বারা মৃত্যুর আবরণকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের রসে অভিষিক্ত হও। ইহাই প্রাণের ধর্ম্ম—ইহাই নববর্ষের বাণী।

কিন্তু জীবনের পথে প্রাণের এই গতি অব্যাহত রাখা যায় কিরূপে? চলিতে চলিতে প্রাণের সঞ্চয় ফুরাইয়া আসে—ক্লান্তি দেখা দেয়, শ্রান্তিতে শরীর ও মন অবসন্ন হয়; তখন সর্ব্বাঙ্গ মৃত্যুর নখরাঘাতে ক্লিষ্ট হয়—ধীরে ধীরে জরা ও বার্দ্ধক্যের ক্রোড়ে আমরা আত্মসমর্পণ করি। এই মৃত্যুকে আমরা ঠেকাইব কিরূপে? প্রাণের নিত্য ক্ষীয়মাণ এই সঞ্চয়কে বাড়াইব কিরূপে? 'বর্ষার পরে জলের অভাবে পুকুরের সাবধানে-সঞ্চিত জলরাশি দিনে দিনে ফুরাইয়া আসে; কিন্তু নদীর সহিত তাহার মূল উৎস পর্ব্বতের যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকায় উহার নিত্য ব্যয়শীল জলধারা অফুরন্ত থাকে।' উৎসের সহিত যোগ রাখিতে হইবে, তাহা হইলে প্রাণের স্রোতে আর ভাঁটা পড়িবে না।

মানবজীবনে এই উৎস কে? আত্মার অন্তরাত্মা পরম পুরুষই এই উৎস। ইনি মানবের আত্মার অন্তরে নিত্য সান্নিবিষ্ট আছেন "সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"। আমাদের যাহা কিছু, যত কিছু সকলেরই মূল কারণ এই পরম পুরুষ। প্রাণ নিত্য এই অফুরন্ত উৎস হইতেই আপন ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া বাহিরে আসিয়া ব্যয় করে, জীবনের বিচিত্র প্রচেষ্টারূপে অভিব্যক্ত হয়।

উপনিষদে এই তত্ত্ব সুন্দরভাবে বোঝান হইয়াছে। 'লোকে যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, যখন সকলে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলে যে, "এ ব্যক্তি সুষুপ্ত"; তখন সে আপনার হৃদয়-গুহাশায়ী যে পরমাত্মা, তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়া একাত্মযোগে যুক্ত হয়; সে তখন পরমাত্মাকে আত্মাতে লাভ করে, পরমাত্মার মধ্যে ডুবিয়া যায়। ......যখন কেহ একটী পাখীকে সূত্রের অগ্রভাগে বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত নিজের হাতে ধরিয়া রাখে, তখন যেমন সেই পাখিটী তাহার ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আশায় চারিদিকে নিয়ত উড়িতে থাকে; উড়িতে উড়িতে অবশেষে পরিশ্রান্ত হইলে কোথাও আর অবলম্বন না পাইয়া বিশ্রাম করিবার আশায় আবার সেই ব্যক্তির হাতেই ফিরিয়া আসে; সেইরূপ আমাদের এই জীবাত্মাও স্বপ্নে ও জাগরণে বিপুল বিষয়রাশির মধ্যে নিপতিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশ্রান্ত হইলে, অবশেষে বিশ্রামের আশায় সুষুপ্তিকালে আপনার শাশ্বত প্রতিষ্ঠাভূমি পরমাত্মাতেই ফিরিয়া আসে।' আমাদের আত্মা পরমাত্মার সহিত প্রেমসূত্রে বাঁধা রহিয়াছে।

আমরা এই তত্ত্ব জানিনা বলিয়াই বাহিরকেই অযথা অধিক মূল্য দিয়া বসি। এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময়ী সুন্দরী ধরণী যে আমাদের চিত্তকে দোলা দেয়—আনন্দ-রসধারায় সিক্ত করে, তাহার অনেকখানিই যে আসে আমাদের অন্তর্লোক হইতে। আত্মারই আনন্দ-রস মনের পথে ইন্দ্রিয়ের পথে নামিয়া আসিয়া বাহিরের বস্তুকে সিক্ত ও সরস করিয়া অমৃতপূর্ণ করিয়া তুলে "এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। তাই তো দেখিতে পাই যাহার মনে আনন্দ আছে, তাহার সকল বস্তুতেই আনন্দ। তাহার নিকট ভাল-মন্দ কিছুই নাই, সবই ভাল; তাহার শত্রু-মিত্র কিছুই, সবই মিত্র। তাহার অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, সে সব পাইয়াছে। তাহার কোন অভাব নাই। তাহার নিকট সুন্দরঅসুন্দর কিছুই নাই—সবই সুন্দর; যে দিকে চায়, সে অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়।

শিশু ও সাধকের অন্তঃকরণ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। একজন প্রকৃতির প্রেরণায়, অন্যে সাধনার শক্তিতে এই যোগ অক্ষুণ্ণ রাখেন বলিয়াই কোথাও কখনও তাঁহাদের আনন্দের অভাব হয় না। আমরা আপন অহঙ্কারের প্রলেপে স্বার্থ-বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতায় প্রকৃতির নিকট হইতে সহজ প্রাপ্ত এই অমূল্য দান হেলায় হারাইয়া ফেলি। তাই তো আজ আমাদের দৈন্যের আর অন্ত নাই। আমাদের বুভুক্ষা এত তীব্র হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে যে, মনে হইতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আহুতি

পাইলেও ইহার শান্তি ঘটিবে না। এই নববর্ষ ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত এই শ্যাম-ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে তৃপ্তির ও স্নিগ্ধতার যে আলো মাখাইয়া দিয়াছে, মানবসমাজে তাহা কোথায়? আজ নববর্ষের নিকট এই শিক্ষাটী গ্রহণ কর—"তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে" যাহা তুমি কাহাকেও দিলে না—বঞ্চিত করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তাহাই তোমার নষ্ট হইল; শুধু তাহাই নহে প্রাণস্পর্শহীন সেই মৃত অস্থিস্তূপ পাষাণভারে তোমাকেও পাতালের অতল গহ্বরে প্রেরণ করিবে। এই উদ্ভিজ্জগৎ যদি শীতের উত্তরবায়ুতে আপনার দীর্ঘকালের সঞ্চিত পত্র-পুঞ্জকে উড়াইয়া না দিয়া অন্ধমায়ায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিত, তবে আজিকার এ শ্যামশোভা আসিত কোথা হইতে? নদী যদি তাহার বিপুল সঞ্চয়কে দু'বাহু প্রসারিত করিয়া মুক্তি না দিত, তবে নিদাঘে তাহাকেও যে পুকুরের মত রিক্ত ও নিঃস্ব হইয়া শোভাহীন হইতে হইত।

আত্মা প্রকাশধর্ম্মী—তাহার প্রকাশের পথে, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের পথে গণ্ডি টানিও না—বাধা সৃষ্টি করিও না; পরমাত্মা ভিতর হইতে তোমার সমস্ত রিক্ততা নিঃস্বতা ও সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া দিবেন; অনন্ত উৎসের সহিত যে তোমার যোগ রহিয়াছে—ভয় পাও কেন? আমরা সেই অনন্ত আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত একএকটী বিস্ফুলিঙ্গ। তাঁহার "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া" আমাদেরই মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। অহঙ্কারের প্রলেপ, সঙ্কীর্ণতার বুদ্ধির বাধা অপসৃত করিলে উহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সূর্য্য যেমন মেঘে ঢাকা থাকিলে তাহার কিরণ দেখা যায় না, অথচ উহা বিদ্যমান থাকে; আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমও সেইরূপ স্বার্থবুদ্ধির মেঘে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; এই বাধা অপগত হইলে উহারা দিব্য বিভায় আপনিই দীপ্যমান হইয়া উঠিবে। তখন জগতের প্রতি বস্তুই সুন্দর, প্রতি বস্তুই আনন্দপ্রদ প্রাণপ্রদ হইয়া উঠিবে। এক এক বস্তু এক এক ভাবে আনন্দ প্রদান করিবে। এই স্থলে জলে আলো অন্ধকারে ঘেরা বহুরূপী জগৎ বিচিত্র সৌন্দর্য্যে রঞ্জিত। নদীসাগর, পাহাড়-পর্ব্বত, তরুলতা, ফুলপাতা, দিবারাত্রি, আকাশ-অন্ধকার, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র, নরনারীর কমনীয় কান্তি, শিশুর হাসি, মাতার প্রেম, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা—কোন্‌টী না সুন্দর? তবে কেন সকলে সর্ব্বদা ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য অনুভব করে না? সেই বাধা—সঙ্কীর্ণতার বাধা। ঊর্দ্ধে আকাশের ঐ প্রগাঢ় নীলিমা, সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় বিকাশ, গাছের কচি কচি পাতার মুহুর্মুহু কম্পন কাহারও হৃদয়ে আনন্দের তুফান তুলিয়া দেয়, কাহারও বা নিকটে ইহা অনাবশ্যক বাধা। পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া কেহ আনন্দ পায়, কেহ বা পায় না। যে পায়, বুঝিতে হইবে তাঁহার অন্তরে আনন্দের উৎস নিত্য উৎসারিত রহিয়াছে; যে পায় না তাহার সেই অন্তরের উৎস অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণতার চাপে মরিয়া গিয়াছে জানিতে হইবে। এই স্বার্থবুদ্ধির মায়াজাল স্বহস্তে ছেদন করিতে হইবে।

এস দীন, এস সর্ব্বহারা! আজ এই পুণ্যলগ্নে জীবনের অমৃতময় প্রাণরস পান কর—নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হও। ক্ষুদ্রের মত দীনের মত নিঃস্বের মত একধারে সঙ্কুচিত থাকিও না। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—তোমরা উত্থান কর—জাগ্রত হও। তোমরা যে অমৃতের পুত্র—অমৃতের সন্তান, সত্যদর্শী ব্রহ্মবাদী ঋষির এই যে মহতী বাণী, ইহা মিথ্যা নহে—ইহা নিতান্তই সত্য। নয়ন হইতে নিদ্রাজড়িমা পরিহার করিয়া জীবনের জয়যাত্রায় অগ্রসর হও। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ভূমৈব সুখং—ক্ষুদ্রের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া মহান্ পুরুষের চরণে শরণ গ্রহণ কর। এই পৃথিবী তোমার গৃহ, ঐ আকাশ তোমার চন্দ্রাতপ, সূর্য্যচন্দ্র তোমার দীপ; তোমাকে আনন্দ দিবার জন্য গাছে ফুল ফুটে, ফল ধরে; দিকে দিকে নদী অমৃতধারা ক্ষরণ করে, বায়ু মধু বহন করে—তুমি ক্ষুদ্র নও। "যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ" এই আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় দিব্যপুরুষ যুগপৎ সকলকে অনুভব করিতেছেন, তিনিই যে তোমার হৃদয়াকাশেও আপন সিংহাসন পাতিয়াছেন। শস্ত্র তোমাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ

করিতে পারে না, জল তোমাকে ক্লিন্ন করিতে পারে না, বায়ু তোমাকে শুষ্ক করিতে পারে না— জরা তোমাকে জীর্ণ করিবে কিরূপে? তুমি তপস্যা কর—তপস্যা কর; ক্ষুদ্রতার আবরণ বিদীর্ণ হউক, মৃত্যু পরাভূত হইয়া মলিন বস্ত্রের ন্যায় পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ুক। তোমার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রীতি-প্রেম-শক্তি শতদল-দলের ন্যায় শোভায় ও সৌগন্ধে দিগন্ত আমোদিত করুক।

হে পরমাত্মন্! যে অসীম আকাশে এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমারই সুনিয়মে বিঘূর্ণিত হইতেছে, তুমি সেই আকাশ হইতেও বৃহত্তর, তুমিই আবার আমার হৃদয়গুহায় অবস্থিত। তোমার ভয়ে বায়ু ছুটিতেছে, সূর্য্য জ্বলিতেছে, মেঘ গর্জ্জিতেছে; তুমিই আবার আমার চক্ষুতে দৃষ্টি, শ্রবণে শ্রুতি ও মননে মতি হইয়া প্রকাশ পাইতেছ। তুমি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—মূক আমরা, তোমার মহিমা কি গান করিব? হে আবিঃ, হে স্বপ্রকাশ! আমাদের দেহে-মনে ও আত্মাতে তোমার প্রেম ও পবিত্রতার তোমার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আলো জ্বলিয়া উঠুক। হে অনন্ত স্বরূপ পরম পুরুষ! তোমার অসীমতায় আমাদের সসীম জীবনবিন্দু বিধৃত হইয়া শোভমান হউক।

নববর্ষে চিন্তা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান তোমার হস্তে যাহা কিছু গচ্ছিত রাখিয়াছেন, মনে করিও না যে, সে সমস্ত তোমার একার ভোগের নিমিত্ত। ঐ সকল গচ্ছিত ধনের সাহায্যে তোমার পরিপার্শ্বস্থ মানবগণের, সহচর ও অনুচরগণের, এমন কি, জীবজন্তুরও অভাব ও দুঃখ তোমাকে যথাসাধ্য মোচন করিতে হইবে। এই কারণেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমার অন্তরে করুণাবৃত্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন—পরের দুঃখ দেখিলে তুমি সহজে গলিয়া যাও, তোমার নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া যায়। ঈশ্বরপ্রসাদে তুমি যখন ধনরাশির অধিকারী হও, তখন বৃদ্ধ ও আতুরদিগকেও তোমার স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টানদিগের ন্যায় বৃদ্ধ ও আতুরদিগকে উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিয়া নিহত করিলে চলিবে না। এরূপ করা ধর্ম্মশাসনের বিরোধী বলিয়া ঐ বর্ব্বরোচিত প্রথা মানুষের সহ্য হইল না; কাজেই উহা ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তুমি চাও যে ভগবান তোমাকে সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখুন। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও যে, তুমি একা তাঁহার সন্তান নও; এই ধরাতলে তাঁহার অসংখ্য অসংখ্য সন্তান আছে; তোমার ন্যায় তাহাদের প্রত্যেকেই তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসার অধিকারী। তাহাদের মধ্যে তুমি যতই ভালবাসা দিতে পারিবে, যতই আপনাকে সম্প্রসারিত করিতে পারিবে, ততই তুমি ঈশ্বরের স্নেহের প্রেমের ও মঙ্গল আশীর্ব্বাদের উত্তরোত্তর অধিক হইতেও অধিকতর অধিকার লাভ করিতে থাকিবে। এই আত্মপ্রসারণের জন্য ধনীর রাজপ্রসাদেও যেমন নির্লিপ্তভাবে—কিন্তু অন্তরে হিতৈষণা-পোষণ করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, দুঃখীর দুর্গন্ধময় অন্ধকার কুটীরের মধ্যেও তোমাকে সেইরূপ নির্লিপ্তভাবে ও হিতৈষণাপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইবে। তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকেই আপনার হৃদয়ে টানিয়া লইতে হইবে। ভগবান যেমন পাপী তাপী, সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র, কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, তুমিও সেইরূপ তোমার আত্মীয় অনাত্মীয়, মিত্র অমিত্র, কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পার না। কেবল তুমি আপনি সুখভোগে মত্ত থাকিলে চলিবে না। সেরূপ মত্ত থাকা তোমার নিজেরই মৃত্যু ও বিনাশের কারণ হইবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

অন্তরে কুচিন্তাকে স্থান দিও না। মনপ্রাণকে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা ও ভক্তির সুগন্ধ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়া রাখিও। অন্তরের কবাট রুদ্ধ রাখিও না— সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিও, যাহাতে শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণীগণ তথায় আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। মঙ্গলময় বিধাতা তোমার অন্তরে যে বুদ্ধি ও বল দিয়াছেন, তোমার হস্তে যে শক্তি ও সামর্থ দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে তোমার চারিদিকে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত কর। জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার নব নব পন্থা আবিষ্কার কর। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রসার বিস্তার কর এবং ভগবানের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া কৃতার্থ হও।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপক।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। ধর্ম্মসংহারক কাহাকে বলে?

পূর্ব্বাপর প্রচলিত যে ধর্ম্মসমূহ, তাহা যতই কেন অপ্রীতিকর ও অনিষ্টকর হউক না, তাহার প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ধূলিসাৎ করা হইল ধর্ম্মসংহারকের কার্য্য। অনেকে বলেন বটে যে, যে ধর্ম্ম অনিষ্টকর তাহা সমূলে উৎপাটন করাই বিধিসঙ্গত ও শ্রেয়স্কর। কিন্তু ইহা মূলত যুক্তিসঙ্গত নয়—ইহা তাঁহাদের যশস্পৃহা ও আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক। যাঁহারা আপনাদের কথাই সকলের মান্য শিরোধার্য্য ও নিতান্তই গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়; ধর্ম্মের মূল যখন ভগবান হইতেই নামিয়া আসিয়াছে, সকল ধর্ম্মেরই কেন্দ্রে যখন ভগবান অধিষ্ঠিত, তখন কোন ধর্ম্মকেই সমূলে উৎপাটন করিবার কথা নিতান্ত দুঃসাহসিক ভিন্ন অপরের মুখে শোভা পায় না—ওরূপ কথা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের নিকট বাতুলের উক্তি বলিয়া উপহাসই লাভ করে। মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদিগের পূজকদিগের সম্মুখে তাহাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাহাদের সেবিত ঐ সকল মূর্ত্তি বিগ্রহ প্রভৃতি বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দেওয়া বা উহাদিগের নিন্দাবাদ প্রচার করা ধর্ম্মসংহারকদিগের অন্যতর কার্য্য।

২। ধর্ম্মসংস্কারক কাহাকে বলে?

দেশ কাল ও অবস্থা প্রভৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মের একএকটি পরিধি সংরচিত হয়। দেশ কাল ও অবস্থা যখন প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন আমাদের ইহা বোঝা উচিত যে, প্রতি জনের সম্বন্ধে, প্রতি দেশের ও জাতির সম্বন্ধে এবং প্রতি মুহূর্ত্তের সম্বন্ধে ধর্ম্মের এই পরিধিসকল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্য নব নব আকার ও প্রকার ধারণ করিতেছে—অন্তত ধারণ করা উচিত। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন, পরিধির আকারে প্রকারে বিভিন্নতা সহজে আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। পরে এই বিভিন্নতা বর্দ্ধিত হইতে হইতে যখন দেশ কাল ও অবস্থার উপযুক্ত সীমা ছাড়াইা চলে, তখনই উহা জনসাধারণকে পূর্ব্ব পরিধিতে চলিবার পথে বড়ই বাধাপ্রদান করে। জনসাধারণ তখন কোন্ পথে চলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এবং কবে এক মহাপুরুষ আসিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত পথ প্রদর্শন করিবেন, তাহারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকে। ভগবানের মঙ্গল বিধানে জনগণের হৃদয়ে যখন সেই প্রতীক্ষার অশ্রূৎপাত নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই এক মহাপুরুষ ভগবানের তেজঃকণা অন্তরে ধারণ করিয়া পরিধির সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, দেশ কাল ও অবস্থার সহিত নবতর সামঞ্জস্যের উপর নূতন পরিধি রচনা করিয়া জনসাধারণকে এক নবতর চলাচলের পথ প্রদর্শন করেন; ইহাই হইল ধর্ম্মসংস্কারকের কার্য্য।

৩। ধর্ম্মসংস্থাপন কাহাকে বলে?

ধর্ম্মসংস্কারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই ধর্ম্মসংস্থাপনাও স্বভাবতই আসিয়া পড়ে, মূলত ধর্ম্মের কেন্দ্র অবিচলিত থাকিলেও ঐ পরিধিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দৃষ্টিও ধর্ম্মকেন্দ্র হইতে অনেকটা নড়চড় হইয়া যায়—দূরে সরিয়া যায়। তখন লোকদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের জ্ঞান ভিত্তি হইতে নড়চড় হইয়া বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে; ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবে লোকেরা বিপথে কুপথে চলিতে থাকে। তখনই অধর্ম্ম সদর্প পদক্ষেপে ধরাতলে বিচরণ করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকেই সাধারণত ধর্ম্মের গ্লানি বলা যায়। এইরূপ ধর্ম্মের গ্লানির অবস্থায় লোকদৃষ্টিতে যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে অভিভূত করিতে উদ্যত দেখা যায়, তখনই ধর্ম্মসংস্কারক এক মহাপুরুষ ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের অন্তরে তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি নবতর আকারে প্রকারে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া ধর্ম্মকেন্দ্রের অভিমুখে ফিরাইয়া আনে। তখন জনসাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধির সূত্রে অবলম্বিত হইয়া নবসংরচিত পরিধি ধর্ম্মকেন্দ্রের উপর দৃঢ়তররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকেই সাধারণত ধর্ম্মসংস্থাপনা বলা যায়।

৪। শ্রীকৃষ্ণ কি ছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংহারক ছিলেন, অথবা ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্থাপক ছিলেন, ইহা বুঝিবার জন্য আমরা সমগ্র মহাভারত আলোড়ন করিতে ইচ্ছা করি না। যে ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলিয়া প্রখ্যাত আছে, আমরা তাহারই ভিতর হইতে দেখিবার চেষ্টা করিব যে, শ্রীকৃষ্ণ কি ছিলেন। ঐ যে গীতার সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই দুইটী চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা হইতেই আমরা বলের সহিত তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্থাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। এখানে তিনি ভগবানের সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইয়া বলিতেছেন যে, ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত

আমি যুগে যুগে সম্ভূত হই, অর্থাৎ আমার ভিতর দিয়া বা প্রয়োজন হইলেই আমার ন্যায় ভগবানের সহিত একাত্মযোগে যুক্ত মানুষের আত্মার ভিতর দিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। বর্ত্তমান যুগে রাজা রামমোহন রায় যে প্রকার ধর্ম্মসংহার কার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত না করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে ও ধর্ম্মসংস্থাপনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ ধর্ম্মসংহার-কার্য্যে এতটুকু প্রবৃত্ত না হইয়া ধর্ম্মসংস্কারমূলক ধর্ম্ম-সংস্থাপনকার্য্যে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

৫। শ্রীকৃষ্ণের সমসময়ে।

শ্রীকৃষ্ণের সমসময়ে সমাজে ধর্ম্মবিষয়ক কিরূপ অবস্থা ছিল, ভগবদগীতা হইতেই আমরা তাহার ন্যূনাধিক আভাস পাইতে পারি। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব কালে যেরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে চলিতে-ছিল, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালেও "সাংখ্য"বাদী ও "যোগ"বাদী এবং অন্যান্য শতবিধ বিভিন্ন মতবাদী-দিগের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ববিবাদ খুবই প্রবলভাবে চলিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মহাভারতে বিভিন্ন মত-বাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টাতেও এইরূপ দ্বন্দ্ব-বিবা-দের অস্তিত্ব সম্যক প্রকাশ পায়। কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ হইতে অনুমিত হয় যুদ্ধের প্রারম্ভে ঐ যে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিতে উদ্যত হইলেন, উহা অজ্ঞানমূলক অতিরিক্ত মায়ার ফলে ভাগ্যের উপর নিতান্ত নির্ভর করার পরিচয় মাত্র। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের সময়ে একদিকে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্র-দায়ের মধ্যে পরস্পরের বিরোধের ফলে, অপরদিকে কর্ম্মবাদকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ফলে, কেবল ভারতবর্ষ নহে, কিন্তু তৎকালীন সমস্ত সভ্য জগত জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সকল যুগের ধর্ম্মসংস্থাপকগণ যেরূপ উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃত সত্যধর্ম্মই সর্ব্ববিধ বিরোধ এবং অযথা নিষ্কর্ম্মিত্ব দূর করিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত সত্যধর্ম্ম সংস্থাপনের দ্বারাই অযথা তর্কবহুল ধর্ম্মবিরোধের এবং নিছক তথাকথিক জ্ঞানমূলক কর্ম্মবাদের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান নিষ্কর্ম্মিত্বের মূলচ্ছেদ সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ উহা বুঝিয়াই অর্জ্জুনের সহিত কথোপকথনচ্ছলে সত্যধর্ম্ম সংস্থাপনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৬। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংহারক ছিলেন না।

অনেকেই মনে করেন এবং গীতা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটী বিখণ্ডিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মমতসমূহের বিরোধী ছিলেন। ইহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। আমরা সমস্ত গীতা অনুসন্ধান করিয়া কোনও স্থানে কোনও ধর্ম্মমতের সহিত বিরোধের আভাস তাঁহার উক্তিতে দেখিতে পাই নাই। প্রকৃত বিরোধ থাকিলে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি যে প্রকার কঠিন মুষলাঘাত দেওয়া সম্ভব মনে করা যাইতে পারে, আমরা ভগবদ্গীতা তন্ন তন্ন করিয়া সেই প্রকার আঘাতের বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। তিনি গীতার কুত্রাপি ধর্ম্মসংহা-রকের ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। বিরুদ্ধ মতবাদ সম্বন্ধে তিনি যেখানে যখনই কোন কথা বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম-সংহারকের উপযুক্ত কঠোর কটূক্তি সহকারে নহে, কিন্তু ধর্ম্মসংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্থাপকের উপযুক্ত ভাষায় সেই সকলের অসারাংশ ঝাড়িয়া ফেলিয়া এবং তাহাদের সার সত্য বাহির করিয়া তাহাদিগকে নিজ মতসমর্থনে দাঁড় করাইয়াছেন।

৭। শ্রীকৃষ্ণ ও বেদবাদ।

আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সময়ে তাঁহার বিরোধী কয়েকটী প্রচলিত মতবাদের এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত আলোচনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

সর্ব্বপ্রথমেই দেখি, তিনি বেদবাদের বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই "বেদবাদ" যে কি, তাহা গীতায় পরিস্ফুটভাবে বলা হয় নাই। পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা করিলে মনে হয়, বেদের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিবাদ অর্থেই বেদবাদ-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এখনও যেমন, অনুমান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের সময়েও এমন এক সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহারা বেদের অন্তর্নিগূঢ় জ্ঞানগম্য সত্যকে (spirit) ছাড়িয়া দিয়া তাহার শব্দরাশিরই (letters) মাহাত্ম্য অধিকতর মানিতেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সময়েই বলি কেন, উপনিষদের সময়েও অনু-মান হয়, এই ভাবের এক সম্প্রদায়ের লোক বিদ্যমান ছিলেন। এ প্রকার অতিরিক্ত বেদবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াই উপনিষদের এক ঋষি সতেজে বলিয়া উঠিলেন—'ঋক বেদই বল, যজুর্ব্বেদই বল, আর সামবেদ বা অথর্ব্ববেদই বল, এ সমস্তই কিছুই কিছু নয়; ইহাদের অন্তর্নিগূঢ় যে ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাই সকলের সার এবং তাহাই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ'—অপরা ঋগ্বেদো-যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ * * * অথ পরায়য়া তদক্ষর-মধিগম্যতে॥ শ্রীকৃষ্ণও বেদের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত ছিলেন—তিনি আপনাকে "বেদবিৎ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বেদসম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া

তিনি পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাণী অনুসরণ করিয়া বলের সহিত বলিলেন যে, 'বেদবাদীগণ বানাইয়া ফেনাইয়া (পুষ্পিত) বেদ সম্বন্ধে নানা কথা বলেন; বেদসকল ত্রৈগুণ্যের সীমা দ্বারা আবদ্ধ; ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে ত্রৈগুণ্যের সুতরাং বেদবাদের অতীত হইতে হইবে। চারিদিক জলে ভরিয়া গেলে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে বেদসকল কোনই প্রয়োজনে আসে না; অর্থাৎ বেদবাক্য অক্ষরস (litarally) অনুসরণ করিয়া বেদবাদী হইবার পরিবর্ত্তে বেদের অন্তর্নিগূঢ় সত্য (spirit) যে ব্রহ্মজ্ঞান; তাহাই মানবের অবলম্বনীয়—

যবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

যে কয়েকটী শ্লোকে বেদবাদের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ধর্ম্মসংস্থারকের উপযুক্ত বেদের প্রতি অথবা বেদবাদীদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার ভাব কোথাও প্রকাশ পায় নাই। ঐ সকল শ্লোকে সংক্ষেপে বেদবাদীদিগের ভ্রান্তি এবং বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার চেষ্টার সার্থকতা বুঝাইবার প্রয়াস প্রকাশ পাইয়াছে।

সেইরূপ "সাংখ্য" "যোগ" প্রভৃতি মতবাদসমূহের তদানীন্তন প্রচলিত অর্থের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া এবং সেই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিয়া স্বমতসমর্থনে প্রয়োগ করিয়াছেন। দু'এক স্থলে তিনি বিরুদ্ধমতবাদীদিগের প্রতি মৃদু উপহাস প্রয়োগ করিলেও তাঁহার সমগ্র উক্তি কোথাও কোনও মতবাদীর প্রাণে আঘাত দিবার মত একটী কথাও প্রয়োগ করেন নাই। বেদবাদীদিগের বাক্যকে "পুষ্পিত" বাক্য বলিয়া এবং "সাংখ্য" ও "যোগের" পার্থক্যবাদীদিগকে "বালক" বা অজ্ঞানী বলিয়াই তাঁহার উপহাস শেষ করিয়াছেন "সাংখ্য—যোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ"।

৮। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ ধর্ম্মের সংস্থাপক।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্কারে অবতীর্ণ হইয়া কোন্ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উপরে বিস্তর বাদানুবাদ চলে এবং চলাও আশ্চর্য্য নহে। তিনি যে ধর্ম্মই কেন সংস্থাপন করুন না, সেই ধর্ম্মের মূলকেন্দ্র যে ব্রহ্মলাভ, সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক "গুহ্যতম" জ্ঞানের প্রচারই যে তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না, এবং করিতে পারেনও না। তিনি সমন্বয়সাধনের (synthesis) দ্বারা বেদবাদীদিগের মতবাদ এবং "সাংখ্য" "যোগ" প্রভৃতি তদানীন্তন প্রচলিত মতবাদসমূহের নিরসন করিয়া ঐ সকল মতবাদের ভিতর দিয়াই নিজের একটী স্বতন্ত্র মত অনায়াসেই দাঁড় করাইলেন। সেই ধর্ম্মমত হইতেছে—ব্রহ্মের সহিত একাত্মযোগে যুক্ত হইয়া এবং সংসারের ছোটবড় সকল কার্য্যই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম হৃদয়ে সেই সকলের অনুষ্ঠান করা; এক কথায়, ব্রহ্মকেন্দ্রক নিষ্কাম কর্ম্মসাধনরূপ যোগই হইল শ্রীকৃষ্ণের নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মেরই প্রতিধ্বনি আমরা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পাই—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎযৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

৯। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম স্বাধীনতার উৎস।

অধুনাতনকালে নানাবিধভাবে সমগ্র গীতার তাৎপর্য্যের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় গীতাকে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতের সমর্থনে নিয়োগ করিতে উদ্যত হন। ইহারই ফলে গীতায় অনেকে সাম্প্রদায়িকতামূলক পরাধীনতার ছাপ দেখিতে পান। কিন্তু আমাদের মতে সমগ্র গীতার কেন্দ্র স্বাধীনতার উৎস একমাত্র পরব্রহ্ম, এবং ইহা প্রচারের বিষয়,—সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার অনন্য উপায় অসাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদ; এক কথায়, সমগ্র গীতার প্রাণ হইল, মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা। ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া যুদ্ধকালীন গীতোক্ত উপদেশের ভিতর দিয়া স্বাধীনভাবে সাধ্য মুক্তিপ্রদ অধ্যাত্মতত্ত্ব নির্ব্বিচারে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। "সাংখ্য" "যোগ" প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তৎকালীন পণ্ডিতমাত্রবোধ্য দার্শনিক তত্ত্বসমূহ জনসাধারণের অন্তরে দুর্ব্বোধ্যতাজনিত পরাধীনতার পাষাণভার চাপাইয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল তত্ত্বের সরল ও সহজ এবং প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাভাবিক মর্ম্ম প্রচার করিয়া জনসাধারণকে মানস পরাধীনতা হইতে মুক্তি দান করিলেন। অনুমান হয়, বেদনামের প্রতি অযথা ভক্তির কারণে সে সময়ে আহারবিহার সম্বন্ধেও ব্রাহ্মণ ও স্মৃত্যুক্ত বিধিনিষেধের শতবিধ নাগপাশ জনসাধারণকে পিষিয়া মারিতেছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ শারীর আহারবিহার সম্বন্ধেও জনসাধারণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এই ভাবের বাণী ঘোষণা করিলেন যে, যে প্রকার আহার এবং যেভাবে পৃথিবীতে বিচরণ সত্ত্বগুণের উত্তেজক অর্থাৎ মানবের দেহ মন ও আত্মার উন্নতি ও কল্যাণসাধক, সেই প্রকার আহার ও সেইভাবে বিচরণই শ্রেয়স্কর। মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণের বাণী গীতার আদ্যন্তমধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বলিয়া গীতোক্তমূলধর্ম্ম দেশ কাল ও অবস্থানির্ব্বিশেষে সকল মানবেরই অন্তরে ধারণ

করিবার উপযোগী। বর্ত্তমানে দেশের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টার সময়ে দেশবাসীগণ যদি গীতার ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত ধর্ম্মের প্রকৃততত্ত্ব প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করেন, এবং উপলব্ধি করিয়া কায়মনোবাক্যে উহা পালন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে বলা বাহুল্য, সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও মঙ্গল এবং তাহারই ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অচিরে দেশবাসীর অধিগত হইবে—সর্ব্ববিধ পরাধীনতার শৃঙ্খলও ঝন্‌ঝন্ করিয়া খসিয়া পড়িবে। তখন ভারতমাতার মুখশ্রী নবতর ভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

১০। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের প্রণালী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত তদানীন্তন প্রচলিত কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত বা দার্শনিক বা অন্যবিধ মতবাদের প্রতি এতটুকু উপেক্ষা বা অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করেন নাই। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি যে, মৃচ্ছিলাদির পূজকদিগের প্রতি অতীব কঠোর অবজ্ঞাসূচক "গোখর" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিসমূহের মধ্যে কঠোর অবজ্ঞাসূচক গ্লানিকর এরূপ একটীও বাক্য আমরা খুঁজিয়া পাই না। তিনি তদানীন্তন প্রচলিত প্রধান প্রধান মতসমূহের মধ্যে ব্রহ্মকেন্দ্রক এক আশ্চর্য্য সমন্বয়সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার সে চেষ্টা নিতান্ত বিফল হয় নাই। তিনি বিভিন্ন মতবাদীদিগের কূটতর্কজাল পরিহার করিয়া সকল মতকে স্বাভাবিকভাবের উপর দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং তাহারই ভিত্তিতে ঐ সকল মতের নবতর ব্যাখ্যা করিয়া তাহারই সাহায্যে নিজের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে জনসাধারণের হৃদয়ে অটল আসন প্রদানে সক্ষম হইলেন। এই ব্যাখ্যাকার্য্যে তিনি ঐ সকল মতবাদের ব্যবহৃত মূল শব্দসমূহের তৎকালে সর্ব্বজনগৃহীত (accepted) অর্থ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া স্বকৃত অর্থ স্বাভাবিকতার ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এমন বলের সহিত বলিয়া গেলেন যে, জনসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি করিতে না পারিয়া এই নবতর অর্থই সাদরে গ্রহণ করিল; পূর্ব্বগৃহীত অর্থসকল জনসাধারণের হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের পুঁথিসমূহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া গেল।

১১। শ্রীকৃষ্ণ আর্য্য বা অনার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলিয়া উক্ত ভগবদ্গীতায় তদানীন্তন প্রচলিত বেদবাদ এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে মত সন্নিবেশিত হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক একেশ্বরবাদ সুদৃঢ়রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় কোন কোন সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে অনার্য্য বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সন্দেহের আরও একটী কারণ এই, শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা বোধ হয় এই যে, নিছক একেশ্বরবাদ ভারতের নিজস্ব নহে, উহা উত্তর এশিয়াখণ্ড হইতে আমদানী করা বস্তু; এবং আর্য্যমাত্রই শ্বেতবর্ণ—কৃষ্ণবর্ণ হইলেই তাহাকে অনার্য্য হইতে হইবে, ইহা যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আমাদের নিকট ইহা নিতান্তই যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিছক একেশ্বরবাদ যে উপনিষদ হইতে গৃহীত, যে উপনিষদের কয়েকটী মন্ত্র পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত হইয়া গীতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই উপনিষদসমূহও তাহা হইলে ভারতের নিজস্ব বলা চলে না—ভারতের বাহির হইতে প্রাপ্ত বলিতে হয়। বলিতে হয় যে ভারতের ঋষিরা দলে দলে এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গিয়া একেশ্বরবাদ শিক্ষা করিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইরূপ কোন প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই; বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সে দেশের লোক, এমন কি, যীশুখৃষ্ট এসিয়ার উত্তর-পশ্চিম হইতে এদেশে আসিয়া প্রকৃত একেশ্বরবাদ শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণবর্ণ হইলেই যে অনার্য্য হইতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। আমার বেশ মনে পড়ে যে, Bridge watter Treatise গুলির একখণ্ডে রাজা রামমোহন রায়ের কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার আর্য্যসন্তুতি একত্র উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে, রাজা রামমোহনের কৃষ্ণবর্ণ ও অনার্য্যত্বের মধ্যে কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই—কৃষ্ণ হইলেই যে মানুষকে অনার্য্য হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; বরঞ্চ অর্জ্জুনের মোহের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "অনার্য্যজুষ্ট" শব্দের প্রয়োগ হইতেই আমাদের অনুমানের সুদৃঢ় সাক্ষ্য পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ অনার্য্য ছিলেন না, আর্য্যই ছিলেন। তবে ইহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার নবপ্রচারিত ধর্ম্মমত বিভিন্ন আর্য্যজাতির সঙ্গে ভারতে ও তাহার বাহিরে নানা অনার্য্য জাতি কর্ত্তৃকও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কর্ম্মযোগের প্রতি হৃদয়ের সমধিক প্রবণতাও নাকি তাঁহার অনার্য্যত্বের পরিচায়ক! আমরা ইহা বাতুলের প্রলাপ উক্তি বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি; ইহার বিপরীতে আমাদের এই অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, নিছক জ্ঞানবাদের উপর সংগঠিত সাংখ্যমতের ফলস্বরূপে প্রসূত নিষ্কর্ম্মিত, মরুভূমিবহুল ভারতের উত্তরাংশে অবস্থিত এশিয়াখণ্ডে একটু বিশেষ স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল।

১২। ভারতের বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার।

আমাদের অনুমান হয়, গীতার ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের নিকট বিশেষভাবে ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই ভারতের বাহিরে উত্তর এশিয়া খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি যে বলিয়াছিলেন যে, 'আমি এই ধর্ম্ম বিবস্বানকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং বিবস্বান উহা মনুকে বলিয়াছেন এবং মনু উহা ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছেন'—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ৪, ১.

ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিবার বহু পূর্ব্বেই সূর্য্যবংশীয় বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু এই প্রবল রাজত্রয়ের শাসিত যে সকল দেশে সূর্য্যোপাসনা বহুলরূপে প্রচারিত ছিল, সম্ভবতঃ যেগুলি তাৎকালিক পারসীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সকল দেশে বহুলরূপে প্রচার করিয়া তৎদেশবাসীগণকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনুমান হয়, বিবস্বান্ একজন প্রবল রাজা ছিলেন এবং সূর্য্যবংশীয় হইবার কারণে তাঁহার রাজ্যে সূর্য্যোপাসনা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাহা বংশানুক্রমে সংরক্ষিত হইয়াছিল। আমাদের আরও অনুমান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের একেশ্বরবাদ তথায় প্রচারিত হইলেও সূর্য্যোপাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই। এই কারণে ঐ সকল দেশে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক জয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার একেশ্বরবাদের সঙ্গে সূর্য্যোপাসনাও প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা নগরী সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য খুবই সহজ হইয়াছিল—তিনি সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া পারস্যের উপকূলে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশের খ্যাতিকামী ও স্বমতের বহুল প্রচারকামী ব্যক্তিগণ আজকাল যে নীতি অনুসরণ করিয়া নিজেদের মতামত প্রথমে বিদেশকে শুনাইয়া পরে দেশে ঘুরাইয়া আনিয়া দেশবাসীকে শুনাইতে প্রবৃত্ত হন, সেই নীতির সূক্ষ্মমর্ম্ম অবগত হইয়া বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ধর্ম্মমত ভারতে প্রচার করিবার পূর্ব্বেই ভারতের বাহিরে বহু বিস্তৃতরূপে প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন। বিবস্বান আবার এক মনুকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই মনু যে কে বা তাঁহার রাজ্য কোথায়,—আমরা এখনও তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। গীতার ভিতরেই মনু চারিজন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, আমাদের অনুমান হয় যে, বিবস্বানের রাজ্যের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান চীন মোগল প্রভৃতি দেশসকল মনুবংশীয়দিগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মনুবংশীয় রাজগণ সম্ভবত সূর্য্যবংশেরই এক শাখার ছিলেন। আবার সূর্য্যবংশের অপর এক শাখার পূর্ব্ব পুরুষ ইক্ষ্বাকু কোন এক মনুর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাই হোক, বিষয়টী এতই বিস্তৃত ও এতই গবেষণাসাপেক্ষ যে, আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা অসম্ভব বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণ যে বহুজন্ম অতীত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, সেই জন্ম-শব্দ বর্ত্তমান কালের সাধারণ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এ বিষয়ও পরিষ্কার করিতে গেলে বহু গবেষণা ও আলোচনা আবশ্যক, যাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমি ইঙ্গিত করিলাম মাত্র।

১৩। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচারে সহায় কাহারা ?

শ্রীকৃষ্ণের সময়ে ভারতে যে সকল তীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ সমুত্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চারিদিকে দৃষ্টিসম্পন্ন সুপণ্ডিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার দূরদর্শিতার ফলে তাঁহার নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায়রূপে তিনি সুপণ্ডিত তদানীন্তন প্রচলিত সর্ব্ববিধ বিদ্যায় বিশেষত সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ ও সংযমী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিনি ধীর, বিনয়নম্র, জ্ঞানবান পাণ্ডবগণকে এবং তন্মধ্যে বিশেষভাবে ধনঞ্জয় অর্জ্জুনকে তাঁহার একান্ত অনুগত ও ভক্ত সহায়রূপে লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বপক্ষে তৎকালীন রাজন্যবর্গেরও অনেকে ছিলেন—যথা দ্রুপদ, সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা। ইহা ব্যতীত অনুমান হয় যে, ভারতের এবং তাহার বহিঃস্থিত আর্য্য ও অনার্য্য জাতিদিগেরও অনেকে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচালিত পাণ্ডবদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণী বাহিনী পূর্ণ করিয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন প্রধানত ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ পাণ্ডবদিগের জ্ঞাতিগোষ্ঠী দুর্য্যোধনাদি ও তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবেরা এবং নানাসূত্রে তাঁহাদের অনুগত রাজেন্দ্রবর্গ যথা—দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতি ইহা ব্যতীত অনুমান হয় যে, শতবিধ দেবতার এবং যক্ষরক্ষাদির ও ভূত-প্রেতাদির পূজনশীল এবং ভোগৈশ্বর্য্যের মোহমদে সমাচ্ছন্ন ভারতের

এবং তাহার বহিঃস্থিত অনেক আর্য্য ও অনার্য্য জাতি কৌরবদিগের একাদশ অক্ষৌহিনী বাহিনী পূর্ণ করিয়াছিল। দণ্ডায়মান সেনানীগণের মধ্যে ভীষ্ম প্রভৃতি উপরোক্ত স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সেনানীর তালিকার হইতে আমরা দেখি যে, তৎকালীন রাজন্যবর্গেরও অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অথচ আমরা দেখি পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা কৌরবদিগের দলে সাধারণ সৈন্য বড় অল্প সংখ্যক নহে, কিন্তু চার অক্ষৌহিনী অধিক ছিল। এইজন্য আমাদের অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, বহু আড়ম্বরপূর্ণ যাগ যজ্ঞাদি এবং ভোগৈশ্বর্য্য যাহাদের অধিকতর প্রিয় ছিল, এইরূপ অনার্য্যপুষ্ট জনসাধারণের অধিকাংশ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মকথার প্রতি মনোযোগ না দিয়া, কৌরবগণের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। চার অক্ষৌহিনী সেনা অধিক থাকিলেও কৌরবদিগের পরাজয়ের কারণ কি? বোধ হয় যে, কৌরব সেনাদলের অনেকে, বিশেষত ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ তাঁহাদিগের নেতাগণের অধিকাংশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ভিত্তি খুবই গভীর ও সুদৃঢ়, এবং সেই কারণে তাঁহার জয়ও সুনিশ্চিত; অপর পক্ষে কৌরবদিগের অবলম্বিত তদানীন্তন প্রচলিত আড়ম্বর বহুল যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সকল লোক সংগ্রহেরই উপায় মাত্র, তাহাদের ভিত্তির বিশেষ গভীরতা বা দৃঢ়তা ছিল না। এই কারণে তাঁহারা অন্তরে অন্তরে কৌরবদিগের পরাজয় এক-প্রকার নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণাদির অনেক উক্তি ও কার্য্য, বিশেষত পুত্রস্নেহে মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রেরও উক্তি হইতে আমাদের অনুমান অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কৌরব-নেতাগণ তাঁহাদের জয় সম্বন্ধে যে সংশয় দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিলেন, সূক্ষ্মদর্শী শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিকে নিশ্চয়ই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই, এই সংশয়ের ফলেই কৌরবগণের যে পরাজয় হইবে, মনে হয়, ইহারই ইঙ্গিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" সংশয়ে যাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত সে নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

১৪। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মূলত ধর্ম্মসংঘটিত।

কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছিল আমাদের অনুমান হয় তাহা মূলতঃ রাষ্ট্রনৈতিক নহে,—কিন্তু ধর্ম্মমূলক। যেমন বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক নহে বা অষ্ট্রীয়ার যুবরাজের হত্যামূলকও নহে—ঐ হত্যা একটা উপলক্ষ মাত্র—কিন্তু পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর হস্ত বিস্তারের অধিকার লইয়া, সেইরূপ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধেরও মূলে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সেই মতাবলম্বন। যদি এই যুদ্ধ প্রকৃতই রাষ্ট্রনৈতিক হইত, তবে যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে কৌরব-গণের নিকট পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই রাজসিংহাসনের উপর পাণ্ডবগণের সমস্ত স্বামীত্ব ত্যাগ করিবার প্রস্তাব উপস্থিতই হইতে পারিত না। এই যুদ্ধ যে ধর্ম্মসংঘটিত তাহা শ্রীকৃষ্ণের "ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং" (গীতা ২য়, ৩৩) এই উক্তি হইতেই আমরা তাহার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হই। এই যুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘটিত না হইলে সমগ্রগীতা ধর্ম্মের উপদেশেই পূর্ণ দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ। এই যুদ্ধ প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক বলিয়াই আসন্ন যুদ্ধের বিপদ-সঙ্কুল মুহূর্ত্তেও অর্জ্জুনের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত ধর্ম্মবিষয়ে সংশয়মূলক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমাধান পূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট স্বমতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে এবং তাঁহার হৃদয় হইতে সংশয় কণ্টক উৎপাটনে যত্নবান হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই ধর্ম্মসংঘটিত যুদ্ধের পরিণতিতে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক আকার ধারণ করিয়াছিল।

মাঝিদের গান।

গুরু বস্তু চিনে নে না।
(ও ভবে) অপারের কাণ্ডারী গুরু—
ওগো তা বিনে কেউ কূল পাবে না।
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
মহাকালে ঘিরে নিলো
গুরু বস্তু চিনে নে না।
আর কবে কি করবি গো বল—
হেলায় হেলায় দিন ফুরালো
মহাকালে ঘিরে নিলো—
(তুই) আর কবে কি করবি গো বল—
ও তোর রঙ্গমহলে পড়ল হানা।
(চেয়ে দেখ) তোর রঙ্গমহলে পড়ল হানা॥
এখনো বহিছে পবন
হতে পারে কিছু সাধন।
অতি বিনয় করে বলছে গোলাপোন
জনম এবার গেলে আর হবে না
মানব জনম এবার গেলে আর হবে না।
হরির নাম ভজবি বলে
এ ভব সংসারে এলে
ঐ তুই কার মায়াতে রইলি ভুলে॥